লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ৫ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ২৩ জিলহজ্জ, ১৪৩৮ হিজরি | ১৫ তাবুক, ১৩৯৬ হি. শা. | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ ঈসাব্দ

জাতিসংঘ ভবনে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন কক্ষ

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত

‘শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া’

পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

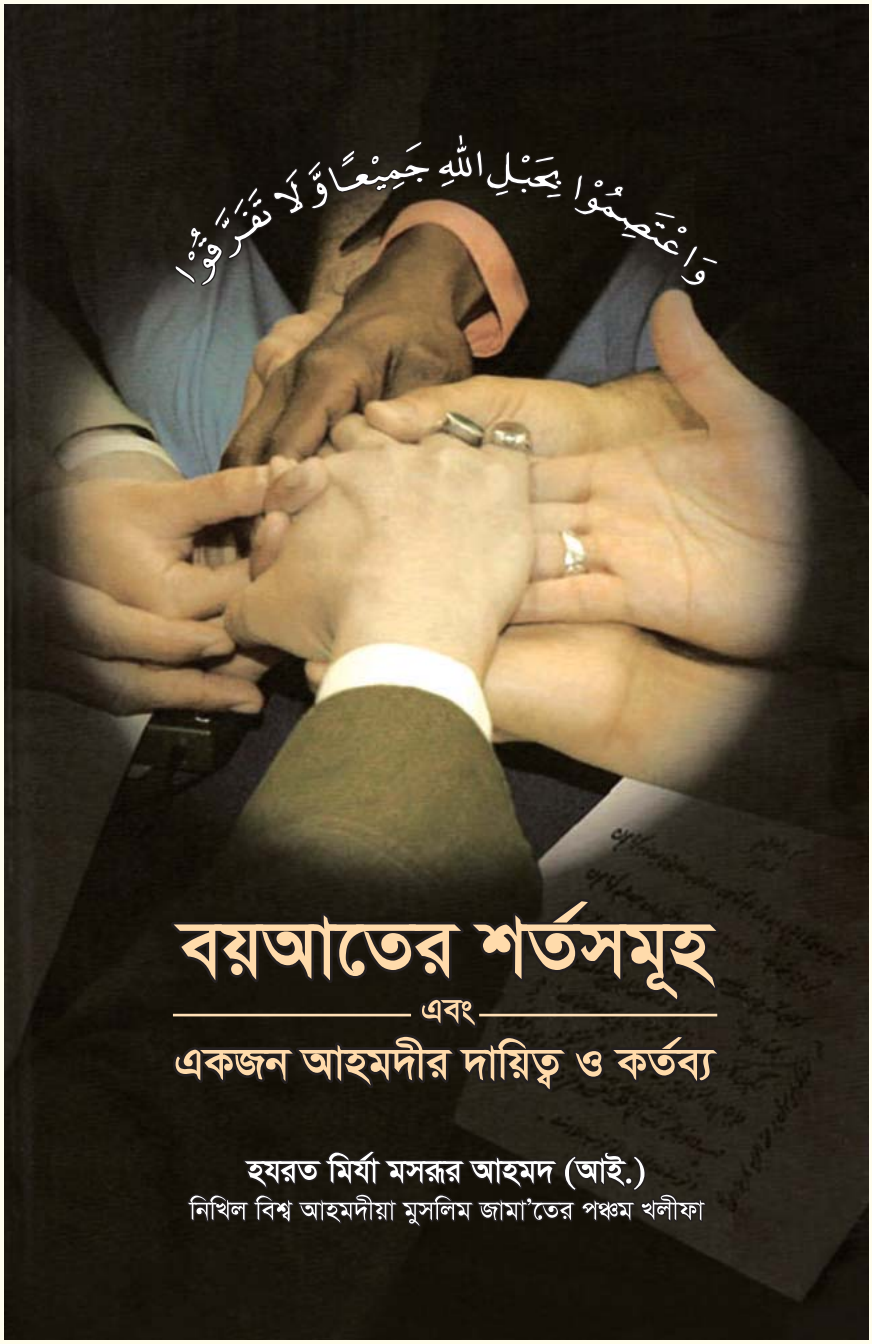

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি ‘গাইড বুক’ বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা’লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত,
বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি?
প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

আর্তমানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

আহমদীয়াতের ইতিহাসে এ এক বাস্তব সত্য যে, সেবার কোন ক্ষেত্র যখনই দৃষ্টিতে এসেছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্ভীক সেবকেরা নিঃস্বার্থ অন্তঃপ্রাণ মমতায় ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সকল মানবসন্তানের কল্যাণে সদা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ জামা'ত আর্থিক ক্ষেত্রে সরকার বা কোন সংস্থা থেকে সাধারণতঃ সাহায্য গ্রহণ করে না আর এরা এমন কিছুর প্রত্যাশীও নয়। তাদের আর্থিক সেবাদান হলো তাদের সেই চাঁদা, যা সদস্যগণ স্ব-পরিশ্রমে উপার্জিত আয় থেকে নিজেদের পেট কেটে, নিজেদের প্রয়োজনকে কাটছাঁট করে মানবতার সেবায় ও আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে 'বায়তুল মা'ল'-এর ঝুড়িতে ভরে দেয়।

ব্যবহারিক সেবা কার্য্যক্রমঃ প্রাচুর্যশালী না হলেও জনসেবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় রাত-দিন এ জামাতেই কর্মচঞ্চল অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ভূ-রাজনৈতিক কারনে বসনিয়া,কসোভো,আলবেনিয়া থেকে আগত মুসলিম শরণার্থী কিংবা মায়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদেরকে সেবাদানের প্রশ্ন আসুক, আফ্রিকার যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরা পীড়িত মানুষের সাহায্য-সহায়তার সঙ্কট দেখা দিক, হাইতি,গুজরাট বা অন্যত্র ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন মেটানোর সুযোগ পাওয়া যাক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের খাদ্য ও পানীয়ের হাহাকার দেখা দেয়াকালে তা জোগানোর প্রশ্ন আসুক, একইভাবে আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে হারিকেন ইরমা-মারিয়া আঘাত হানুক কিংবা বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড় সিডর,আইলা আক্রান্ত বা বন্যা-কবলিত এলাকার বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারকল্পে শ্রমসেবা প্রদানের সুযোগলাভ হোক , জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্রে ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক, কিংবা সুনামী প্রপীড়িত ইন্দোনেশিয়াসহ দ্বীপদেশগুলোর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিক, আহমদীয়া জামাতের নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবীরা সেবার ঝাণ্ডা সমুন্নত রেখে অবনত মস্তকে সর্বত্র সেবায় নিয়োজিত থাকে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক সংস্থা Humanity first জাতিসঙ্ঘের রেজিষ্ট্রিভুক্ত এক সেবা-সংগঠন হিসেবে বিশ্বের অর্ধশতাধিক দেশে বহুবিধ মানবসেবামুলক কাজ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে করে চলছে। ভারতীয় উপমহাদেশ ও আফ্রিকার খরা-পীড়িত বিভিন্ন স্থানের পিপাসার্ত লোকদের সুপেয় পানি সরবরাহ করতে নলকূপ বসিয়ে দিচ্ছে, কোথাও অন্ধ লোকদের শল্য-চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি উপহার দিচ্ছে। মানব-সৃষ্ট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অঙ্গহানি ঘটেছে যাদের, তাদেরকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে আর প্রয়োজনে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েও সাহায্য করা হচ্ছে। গৃহহীনদের ঘর বানিয়ে দিচ্ছে, অভুক্তদের খাবার আর শিশুদেরকে দুধ ও পুষ্টিকর শিশুখাদ্য সরবারাহসহ মাতৃসেবা প্রশিক্ষণও প্রদান করছে। অসহায় এতিমদের পারিবারিক আবহে লালন-পালন করছে।

আবার জলাবদ্ধতায় যাদের নৌকা প্রয়োজন তাদেরকে তা গড়িয়ে দিচ্ছে। গরীব জেলে, মাছ শিকার করে যারা জীবিকা চালায় প্রয়োজনে তাদেরকে মাছ ধরার জাল দিচ্ছে, এই Humanity First সংগঠন। এসব সেবাকার্য নাম কামানোর জন্য নয় বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায়ও নয় বরং কেবলমাত্র ঐশী সন্তুষ্টিলাভের অনুপ্রেরণায় করা হচ্ছে। কেননা, এটাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং ইসলাম আহমদীয়াতে হুকুকুল ইবাদের এটাই মূর্তমান প্রতীক আর এই উদ্দেশ্যেই নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রায় নবগতি সঞ্চার করেছেন, যদিও সূচনাকাল থেকেই আহমদীয়াত সেবামুলক কর্যক্রমের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

মানবসেবার এই উন্নতমান চিরজাগরুক রাখতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) Humanity First- এর সেবকদেরকে সম্বোধন করে ২৪ জানুয়ারী ২০১৫ দিকনির্দেশনা দানকালে বলেন, **"এই সংস্থার প্রতিটি সদস্যের উচিত, নিজ শক্তি-সামর্থ্য ও দক্ষতার সবটা উজাড় করে দিয়ে অপরের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকা। সেই সাথে শান্তি-স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভে অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে যারা, তাদেরকে আরাম পৌঁছানোর জন্য সেবকদের উচিত, সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট বরন করে নিতে আর সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকা।"**

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সেবাদান কার্যক্রমঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিরঙ্কুশ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এক ঐশী সংগঠণ। কোন ভূ-রাজনৈতিক সীমারেখায় এ জামাতের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, এর উদ্দেশ্য হলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে তৌহীদের প্রতি অর্থাৎ আল্লাহর পানে আহ্বান করা। ইসলামের বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছানো এবং মানব সন্তানের মাঝে এক পবিত্র বিপ্লব সৃষ্টি করা। এ মহান উদ্দেশ্যাবলী পুরণের লক্ষ্যে মানবের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট খেলাফতে রাশেদার ছায়ায় রাতদিন কর্মতৎপর রয়েছে এই জামা'ত।

পরিসংখ্যাণের দিক থেকে, বর্তমান বিশ্বে ২১০টি রাষ্ট্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রতিষ্ঠিত। সারা পৃথিবীতে কয়েক হাজার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদ নির্মাণের এই কাজ নিত্যদিনই বেড়ে চলছে। এ কল্যাণ বিতরণ ধারার সাথে পশ্চাৎপদ ও উন্নত বিভিন্ন দেশে শত শত মসজিদ, স্কুল, কলেজ, জামেয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করে সামগ্রিকভাবে মানবসম্পদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এতে উপকৃত হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ।

এ ছাড়াও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে আর শুদ্ধ জীবনাচারে স্ব-শিক্ষিত মানুষ গড়তে রয়েছে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল **mta International,** যার মাধ্যমে প্রত্যেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর তাজা দিক-নির্দেশনা লাভ করে থাকে।

সেবার ক্ষেত্রে আরও একটি মহান সেবা যা জামা'তে আহমদীয়া বিশেষভাবে চতুর্থ খেলাফতকাল থেকে বর্ধিত হারে দিচ্ছে,তা হলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। যুগ-খলীফার আশিসপূর্ণ দোয়ার কল্যাণে গরীব দেশাগুলোতে হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারী প্রদত্ত চিকিৎসা সেবায় গরীব ও দুর্দশাগ্রস্ত রোগীরা আসাধারণভাবে নিরাময় লাভ করছে।

ফলে আজ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মানবের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এক কার্যকর আরোগ্য-নিকেতনে পরিণত হয়েছে। এর কল্যাণ কেবল আহমদীদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে যাক, কায়মনো বাক্যে মহান আল্লাহর সমীপে আমাদের এই দোয়াই থাকবে।

সূচিপত্রে

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
'বারাহীনে আহমদীয়া' (৩য় খণ্ড) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	৬
এযালায়ে আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)	১১
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা**	১৪
লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ **জুমুআর খুতবা**	২০
নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমের সহমর্মিতায় **Press Releases**	২৯
সতর্কবাণী	৩১
নাফ নদীর তীরে মানবতা কাঁদে মাহমুদ আহমদ সুমন	৩২
বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ	৩৫
আমি কিভাবে আহমদী হলাম মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)	৩৭
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৪০
প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত নবীদের সন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র নবী ছিলেন কি?	৪২
সংবাদ	৪৮
আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন	৫২

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ①

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنۡ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ ②

১। স্বতঃপ্রণোদিত অসীমদাতা পরম করুণাময়, বার বার কৃপাকারী [ক]আল্লাহর নামে।

২। মহিমা ও পবিত্রতা তাঁরই, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি-কালে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়[১৫৯০] নিয়ে[১৫৯১] গেলেন, [খ]যার চারপাশকে আমরা আশিসমন্ডিত করেছি। (আমরা তাকে সেখানে এ জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম) যেন আমরা তাকে আমাদের (কিছু) নিদর্শন[১৫৯১-ক] দেখাই। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৫৯০। এ আয়াতে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর এক কাশফ (দিব্যদর্শন) এর কথা ব্যক্ত হয়েছে যা অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে মে'রাজ (আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণ) বলে পরিচিত। সাধারণের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে আমাদের মতে এ আয়াতে নবী করীম (সা.)-এর ইসরা (রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সফর) সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে যাতে মহানবী (সা.) কাশফে মক্কা থেকে জেরুযালেম পর্যন্ত সফর করেছেন। মে'রাজ সম্পর্কে সূরা 'আন নাজমে' সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আন নাজমে উল্লিখিত ঘটনাসমূহের বর্ণনা রয়েছে আয়াত ৮-১৮তে। এ আয়াতসমূহ নবুওয়তের পঞ্চম বছরে রজব মাসে কিছু সংখ্যক সাহাবার (রা.) আবিসিনিয়াতে হিজরতের পর পরই অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীস শরীফে রসূল করীম (সা.)-এর মেরাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যুরকানীর মতে তা নবুওয়তের একাদশ বছরে সংঘটিত হয়েছিল এবং মূইর ও কোন কোন খ্রিষ্টান লেখকের মতে নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে ঘটেছিল। যা হোক ইবনে সাআদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে হিজরতের ১ বছর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে ইসরার এ ঘটনা ঘটেছিল (আল খাসাইসুল কুবরা)। বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন, হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস পূর্বেই ইসরা সংঘটিত হয়েছিল। এরূপে সংশ্লিষ্ট সব বর্ণনা থেকেই প্রতীয়মান হয়, নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হিজরতের এক বছর বা ছয়মাস পূর্বে ইসরার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ে দশম বছরে হযরত খাদীজা (রা.)-এর মৃত্যু হয়। তখন হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর গৃহে বসবাস করছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের পঞ্চম বছরে। অতএব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ের মধ্যেও ৬/৭ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই এ ঘটনা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া সেইসব ঘটনা যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মেরাজের ঘটনা বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে তা ইসরার ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনা দু'টি আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর ব্যাপার। হযরত নবী করীম (সা.) সশরীরে উর্ধ্বগমন করেন নি বা জেরুযালেমেও গমন করেন নি।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তান্তও এ মতের সমর্থন করে যে, এ দু'টি ঘটনা একটি অন্যটি থেকে সম্পূণর্ভাবে আলাদা, (ক) পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আন নাজমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মে'রাজ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইসরা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। অথচ আলোচ্য আয়াতে তাঁর ইসরার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মেরাজ সম্পর্কে কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। (খ) ইসরা সংঘটিত হওয়ার রাতে রসূল করীম (সা.) তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন এবং তিনি শুধু তাঁর জেরুযালেম সফরের কথাই বলেছেন, জান্নাত সফরের কোন কথাই বলেন নি। তিনিই (উম্মে হানী) প্রথম মহিলা যাঁর নিকট মহানবী (সা.) তাঁর জেরুযালেমে রজনীকালের আধ্যাত্মিক ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং অন্ততপক্ষে সাত জন মোহাদ্দিস (হাদীস সংগ্রহকারী) উম্মে হানীর নাম উল্লেখের সাথে চারজন ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াতকারীর বরাত দিয়েছেন যাঁরা উম্মে হানীর কাছ থেকে উক্ত ঘটনা শুনেছেন। এই চারজন বর্ণনাকারী একই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) যে রাতে জেরুযালেম ভ্রমণ করেছিলেন সে রাতেই তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তনও করেছিলেন। **[টিকার অবশিষ্টাংশ ১৩ পৃষ্ঠায়]**

হাদীস শরীফ

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে , আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) 'তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে'। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও তাকে রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল', তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক– বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই– আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন– সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপরজন পশ্চিমের, যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে দিবেন আর বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদ– **মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ**,
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

খোদা তা'লার সাহায্যেই খোদা তা'লাকে লাভ করা যায়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার এক নাম 'পরাক্রমশালী'। স্বীয় সম্মান তিনি কাউকেও দেন না, কেবল তাদেরকেই দেন, যাঁরা তাঁর ভালবাসায় নিজেদেরকে বিলীন করে। খোদার এক নাম 'যাহের'। তাঁর তৌহীদ ও এক-অদ্বিতীয় গুণের প্রকাশস্থল যারা এবং যারা তাঁর প্রেমে বিগলিত হয়ে যায়, তারা তাঁর গুণাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয়। এদেরকে ব্যতীত তিনি অন্য কারও নিকট নিজকে প্রকাশ করেন না। স্বীয় জ্যোতি: হতে তিনি তাদেরকে জ্যোতি: দান করেন এবং স্বীয় জ্ঞান হতে তিনি তাদেরকে জ্ঞান দান করেন। তখন তারা নিজেদের সমগ্র মন প্রাণ ও উজাড় করা ভালবাসা দ্বারা সেই নি:সঙ্গ-বন্ধুর উপাসনা করে এবং তার সন্তুষ্টি এইভাবে চায়, যেভাবে তিনি নিজেই চাহেন।

মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে। কিন্তু কোন্ উপাসনা। কেবলমাত্র অনেক সেজদা, রুকু ও কেয়াম দ্বারা কি এই উপাসনা হয়? অথবা যারা অনেকবার তসবীহের দানা টিপে, তাদেরকে কি খোদা-প্রেমিক বলা যেতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে, খোদার ভালবাসা যাকে এই পর্যায়ে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে যে, তার সত্তা নিজের মধ্য হতে উঠে যায়। প্রথমত: খোদার অস্তিত্বের ওপর পূর্ণ-বিশ্বাস থাকতে হবে। অত:পর খোদার সৌন্দর্য ও দয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে হবে। এতদ্ব্যতীত তাঁর সাথে ভালবাসার সম্পর্ক এইরূপ হবে, যেন প্রেমের বেদনা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজ করে এবং এই অবস্থা প্রতি মুহূর্তে তার চেহারায় বিকশিত হয়। খোদার মহিমা হৃদয়ে এইরূপে থাকতে হবে যেন সমগ্র বিশ্ব তাঁর সত্তার সম্মুখে মৃত সাব্যস্ত হয়। প্রতিটি ভীতি তাঁর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত হতে হবে, তাঁর বিরহ বেদনায় কাতরতার স্বাদ লাভ করতে হবে, তাঁর সাথে একান্তে স্বস্তি লাভ করতে হবে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট হৃদয়ের শান্তি পাওয়া যাবে না। অবস্থা যদি এরূপ হয়ে যায়, তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তা'লার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এ জন্য খোদা তাআলা এই দোয়া শিখিয়েছেন : **ইয়াকানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন** অর্থাৎ আমরা তোমার উপাসনা তো করি, কিন্তু তোমার পক্ষ হতে বিশেষ সাহায্য না পেলে আমরা কখনো উপাসনার হক্ আদায় করতে পারি না। খোদাকে নিজের প্রকৃত-প্রেমিক সাব্যস্ত করে তাঁর উপাসনা করাই **'বেলায়েত'** (বন্ধুত্ব)। এরপর আর কোন স্তর নেই। কিন্তু তাঁর সাহায্য ছাড়া এই স্তর লাভ করা যায় না। এটা লাভ করার চিহ্ন এই যে, খোদার মহিমা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে, খোদার প্রেম হৃদয়ে শেকড় গাড়বে, অন্তর তাঁর ওপর ভরসা করবে, তাঁকে পছন্দ করবে, সকল কিছুর উর্ধ্বে তাঁকে প্রাধান্য দিবে এবং তাঁর স্মরণকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করবে। ইব্রাহীমের ন্যায় যদি নিজের হাতে নিজ প্রিয়-পুত্রকে যবাই করার আদেশ হয়, বা নিজেকে আগুনে ফেলার ইঙ্গিত হয়, তবে এইরূপ কঠোর আদেশকেও ভালবাসার আবেগে পালন করবে এবং স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এতখানি সচেষ্ট হতে হবে, যাতে তাঁর আনুগত্যে কোন ফাঁক-ফোঁকড় না থাকে।

এটা অতি সূক্ষ্ম প্রবেশপথ এবং এই শরবতটি অত্যন্ত তিক্ত শরবত। অল্প লোকই এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং শরবত পান করে। ব্যভিচার হতে বাঁচা কোন বড় ব্যাপার নয় এবং কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা না করা বড় কোন কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়াও কোন বড় গুণ নয়। **কিন্তু সব কিছুর ওপর খোদাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁর জন্য খাঁটি ভালবাসা এবং খাঁটি আবেগে পৃথিবীর সকল তিক্ততা স্বীকার করে নেয়া বরং নিজের হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা ঐ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণ (সত্যবাদী) ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। এটা সেই ইবাদত যা সম্পাদনের জন্যই মানুষ প্রত্যাদিষ্ট হয়েছে। যে ব্যক্তি এই মানের ইবাদত করে, তার এই কর্মের জন্য খোদার পক্ষ হতেও একটি কর্ম সম্পাদিত হয়। এর নাম পুরস্কার।**

(হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ৪৪-৪৫ পৃ: থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৩য় খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

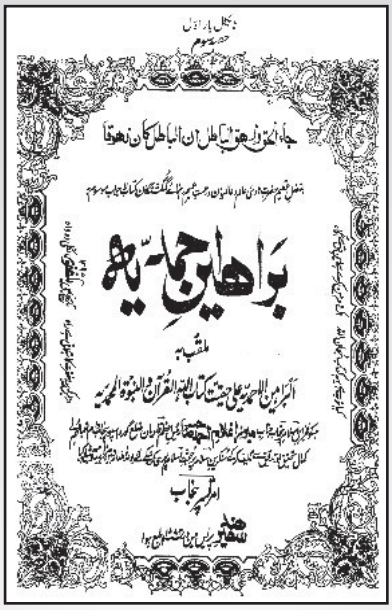

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৩৪তম কিস্তি)

এই সন্দেহ উম্মাদের চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি মনোবৃত্তি। আলো বিকীরণকারী সূর্যের আলো অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে কিছু স্থান পর্যন্ত যদি পৌঁছে না থাকে, বা কিছু মানুষ পেঁচার ন্যায় সূর্য দেখেও চোখ বন্ধ করে রাখে, তাহলে এর ফলাফল কী এটি দাঁড়াবে যে, সূর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়? যদি কোন বিরান-ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত না হয়, বা কোন লবণাক্ত ভূমি এর কল্যাণে সিক্ত না হয়, তাহলে সেই রহমত-বারি বর্ষণের বিষয়কে কী মানুষের কর্ম মনে করা হবে? এমন সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যেই স্বয়ং আল্লাহতা’লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঐশী ইলহামের মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাওয়া সব মানুষের ভাগ্যে জোটে না, বরং স্বচ্ছ প্রকৃতির সেসব মানুষের জন্য সেই হিদায়াত, তাকওয়া ও পুণ্যকর্মের বৈশিষ্ট্যে যারা সমৃদ্ধ। এলহামের উৎকৃষ্ট দিক নির্দেশনা থেকে তারাই লাভবান হয় এবং তা থেকে কল্যাণলাভ করে আর তাদের কাছে খোদার ইলহাম অবশ্যই পৌঁছে যায়। এর মধ্য হতে কিছু আয়াত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

الٓمّٓ ②

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ③

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ④

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ⑤

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑥

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَ عَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ⑧ ع

(সূরা আল্ বাকারা: ১-৮)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ②

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ⑤

(সূরা আল্ জুমুআ: ৩-৫)

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মাঝে প্রথমে الٓمٓ (১) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ। সম্পর্কে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, কত সূক্ষ্ম-সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে, অথচ সংক্ষেপে খোদা তা'লা উল্লিখিত সন্দেহের নিরসন করেছেন।

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার **ইল্লতে ফায়েলী** বা 'নিমিত্ত কারণ' (efficient cause) বর্ণনা করেছেন আর এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন الٓمٓ। আমিই খোদা, আমিই সবচেয়ে বেশি জানি। অর্থাৎ আমিই এই গ্রন্থের নাযিলকারী , যিনি সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান যাঁর সমতুল্য জ্ঞান কারও নেই। এরপর কুরআনের **ইল্লতে মাদি** (material cause), বা উপাদানগত-কারণ অর্থাৎ নিয়ামক বর্ণনা করেছেন আর এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, **যালিকাল কিতাব** অর্থাৎ সেই গ্রন্থ এত মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে, এর 'উপাদানগত-কারণ' হলো খোদার জ্ঞান অর্থাৎ যার সম্পর্কে প্রমাণিত যে, এর উৎস ও প্রস্রবণস্থল হলো প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক আদি সত্তা– খোদা তা'লা। এখানে আল্লাহ্ তা'লা ذٰلِكَ বা **'সেই'** শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা দূরের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ গ্রন্থ সেই মহান গুণাবলীর আধার, একক সত্তার জ্ঞান হতে উৎসারিত, যিনি নিজ সত্তায় অনন্য ও অতুলনীয়, যার অতুলনীয় জ্ঞান ও সূক্ষ্ম রহস্যাবলী মানুষের দৃষ্টিসীমার বহু ঊর্ধ্বে। এরপর এর **'ইল্লতে সূরী'** (formal cause) বা 'আকারগত-কারণ' যে প্রশংসাযোগ্য, তা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, **লা রাইবা ফিহে** অর্থাৎ কুরআন আপন গুণে এমন প্রমাণসমৃদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত দশা ও অবস্থানে রয়েছে যে, এ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ এটি অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় গাঁথা ও কাহিনী-সর্বস্ব নয়, বরং তা সুদৃঢ় ও নিশ্চিত যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক, অধিকন্তু স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অনুকূলে অতি স্পষ্ট যুক্তি ও পর্যাপ্ত প্রমাণাদি তুলে ধরে, যা নিজ গুণেই একটি নিদর্শন এবং সন্দেহ-সংশয় নিরসনের ক্ষেত্রে সুতীক্ষ্ম তরবারীর মর্যাদা রাখে।

খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে তা কেবল এই সন্দেহ বা অনুমানের স্তরে ছেড়ে দেয় না যে, **খোদা থাকা উচিত;** বরং এই নিশ্চিত ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উপনীত করে দেয় যে, **'তিনি আছেন'**। তিনটি কারণের এই মাহাত্ম্যই তিনি বর্ণনা করেছেন। এ তিনটি কারণের প্রত্যেকটির অসাধারণ হওয়া এবং প্রভাব বিস্তার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ও সুমহান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও চতুর্থ কারণ অর্থাৎ কুরআন অবতরণের 'চূড়ান্ত বা অবধারিত কারণ' (final cause or ultimate cause), যা কি-না পথ প্রদর্শন ও হিদায়াত দেয়া, তা কেবল মুত্তাকীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, **হুদাল্লিল মুত্তাকিন** অর্থাৎ এ গ্রন্থ কেবল সেসব যোগ্য প্রকৃতির লোকদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে যারা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, সুস্থ-বুদ্ধি, সঠিক চিন্তাধারা, সত্য সন্ধানের প্রতি গভীর অনুরাগ ও সঠিক উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য রাখার সুবাদে অবশেষে তাদের ঈমান, খোদা সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান ও পুর্ণ তাকওয়ার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ স্বীয় চিরন্তন জ্ঞানের ভিত্তিতে খোদা যাদের সম্পর্কে জানেন যে তাদের প্রকৃতি, এই হিদায়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা ঐশী সত্য তত্ত্বে উন্নতি করতে পারে, তারা অবশেষে এ গ্রন্থের মাধ্যমে হিদায়াত পাবে আর এই গ্রন্থ তাদের কাছে অবশ্যই পৌঁছুবে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অবশ্যই তাদের সঠিক পথে আসার সামর্থ্য প্রদান করবেন।

দেখ! এখানে খোদা তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন, খোদার পবিত্র জ্ঞানে যারা হিদায়াত পাওয়ার যোগ্য আর প্রকৃতিগতভাবে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত, তারা অবশ্যই সঠিক পথের দিশা লাভ করবে। আর এ আয়াতের পর যেসব আয়াত লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে এরই বিশদ বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, (খোদা জানেন) ঈমান আনয়নকারী যতজনই রয়েছে, তারা যদিও এখনও মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হয় নি, কিন্তু অবশেষে পর্যায়ক্রমে সবাই অন্তর্ভূক্ত হবে।

আর বাইরে থেকে যাবে কেবল তারা, যাদের সম্পর্কে খোদা ভালোভাবেই জানেন যে, তারা ইসলামের সত্য-সঠিক পথ গ্রহণ করবে না। তাদের হিতোপদেশ দেয়া হোক বা না হোক, তারা ঈমান আনবে না, বা তাকওয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের পরম মার্গে তারা পৌঁছুবে না। এক কথায়, এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, কুরআনে বিধৃত পথ-নির্দেশনা থেকে কেবল মুত্তাকীগণই লাভবান হতে পারে, যাদের অবিকৃত প্রকৃতির ওপর অবাধ্য প্রবৃত্তির অমানিশা জয়যুক্ত হতে পারে না,এই সঠিক পথের দিশা অবশ্যই তারা লাভ করবে।

কিন্তু যারা খোদাভীরু নয়, তারা কুরআনের দিক-নির্দেশনা থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও লাভবান হয় না আর এর হিদায়াত এমনতেই তাদের কাছে পৌঁছে যাবে– এটিও বাঞ্ছিত নয়। সংক্ষেপে উত্তর হলো, পৃথিবীতে যেমন দু'ধরনের মানুষ দেখা যায় –কিছু হলেন মুত্তাকী ও সত্যান্বেষী, যারা সত্য গ্রহণ করে, অপরদিকে কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা স্বভাবগতভাবে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ। তাদের উপদেশ দেয়া বা না দেয়া উভয়ই সমান। এখনই আমরা একথাও বর্ণনা করে এসেছি, যাদের কাছে মৃত্যু পর্যন্ত কুরআনের সঠিক পথনির্দেশনা পৌঁছেনি বা যাদের কাছে ভবিষ্যতেও পৌঁছুবে না, কুরআন তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীভূক্ত করে। সুতরাং যাদের কাছে কুরআনের হিদায়াত বা দিক-নির্দেশনা পৌঁছে নি, তারা হবে প্রথম প্রকার, অর্থাৎ হিদায়াতপ্রাপ্তদের শ্রেণীভুক্ত! কুরআন শরীফের বিরোধিতায় এমন দাবি করা আহম্মকের কাজ বৈ-কী!

কেননা 'হতে পারে' খণ্ড বাক্যটি কোন নিশ্চিত প্রমাণ নয়, কিন্তু পবিত্র কুরআনে কোন বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা হলে, তা নিরঙ্কুশ বা অকাট্য প্রমাণের মর্যাদা রাখে।

এর কারণ হলো, সেটি উৎকৃষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বা সত্য সংবাদদাতার পক্ষ থেকে। সুতরাং যে এর সংবাদকে নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে করে না তার জন্য আবশ্যক হবে যে, এর খোদার পক্ষ থেকে হওয়া সংক্রান্ত যেসব প্রমাণ রয়েছে তা খন্ডন করে দেখানো, যার কিছু আমরা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি।

যতক্ষণ সে খন্ডন করতে অক্ষম ও ব্যর্থ থাকবে, ততক্ষণ ন্যায়নিষ্ঠা ও ঈমানের প্রমাণ দেয়ার রীতি হবে, সে বিষয়কে সঠিক ও সিদ্ধ মনে করা; যার সঠিক হওয়া সম্পর্কে এমন গ্রন্থে সংবাদ রয়েছে এবং যা নিজেই আপন সত্যতার প্রমাণ বহন করে। কেননা, অন্তর্নিহিত বিষয়ের সত্যতার প্রমাণ বহনকারী এক গ্রন্থের, 'ঘটা সম্ভব' মর্মে কোন সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সে বিষয়ের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রমাণ হয়ে থাকে। আর এটি জানা কথা যে, একটি চূড়ান্ত সাক্ষ্য ও নিশ্চিত প্রমাণকে অবজ্ঞা করে এর বিপরীতে ভিত্তিহীন সন্দেহের অবতারণা করা এবং অমূলক ধ্যান-ধারণাকে হৃদয়ে স্থান দেয়া অবিবেচক ও সরলতার অতিরঞ্জন-বিশেষ।

যদি একথা বল যে, যাদের কাছে ঐশী গ্রন্থ পৌঁছেনি তাদের মুক্তির কি হবে? এর উত্তর হলো, এমন মানুষ সম্পূর্ণরূপে বন্য ও মানবীয় বোধ-বুদ্ধি-বিবর্জিত হয়ে থাকলে সব ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে তারা মুক্ত,আর পাগল, উম্মাদ এবং কান্ড-জ্ঞানহীন বলেই তারা গণ্য হবে; কিন্তু যাদের মাঝে কিছুটা বিবেক-বুদ্ধি ও চৈতন্যবোধ রয়েছে, তাদেরকে তাদের বোধ-বুদ্ধি অনুপাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হৃদয়ে যদি এ সন্দেহ জাগে যে, বিভিন্ন প্রকার স্বভাব-প্রকৃতি খোদা কেন সৃষ্টি করলেন? সবাইকে এমন শক্তি-বৃত্তিকেন দান করলেন না, যার কল্যাণে তারা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান ও খোদাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ করতে পারত? অতএব স্মরণ থাকে যে, এ প্রশ্নও খোদার কাজে অনর্থক নাক গলানো – যা কোনভাবেই বৈধ নয়। সব বিবেকবান বুঝবে যে, সকল সৃষ্টিকে একই পর্যায়ে রাখা আর সবাইকে পরমোৎকর্ষ শক্তি-বৃত্তি প্রদান করা খোদার জন্য আবশ্যক নয়।

এটি তাঁর একান্ত কৃপা। তাঁর ইচ্ছা, যার প্রতি পছন্দ হয় কৃপা করবেন, যার জন্য পছন্দ নয় করবেন না। যেমন তোমাদেরকে খোদা তা'লা মানুষ বানিয়েছেন কিন্তু গাধাকে মানুষ বানান নি। তোমাদের বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, ওদের দেন নি বা তোমাদেরকে জ্ঞানের অলংকারে সজ্জিত করা হয়েছে ওকে নয়। এসব কিছু মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কোন অধিকার এমন, যা কেবল তোমাদের প্রাপ্য, গাধার নয়। বস্তুতঃ যেখানে খোদার সৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে মর্যাদার তারতম্য বিদ্যমান, কোন বুদ্ধিমান যা স্বীকার না করে পারবে না; সেখানে প্রশ্ন হলো, ক্ষমতাধর সর্বাধিপতির সামনে এমন সৃষ্টি, যাদের বড় হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না বরং অস্তিত্বেরও কোন অধিকার যাদের নেই, তারা কিছু বলার অধিকার রাখে কি? বান্দাদের অস্তিত্বের পোশাক পরিধান করানো তাদের ওপর খোদার একটি অপার দান ও অনুকম্পা বৈ আর কী? আর এটি জানা কথা যে, দাতা ও অনুগ্রহশীল সত্ত্বা স্বীয় দান ও অনুগ্রহ বৃদ্ধি বা হ্রাসের অধিকার রাখেন। যদি কম দেয়ার স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে বেশি দেয়ার স্বাধীনতাও তাঁর থাকবে না– এহেন পরিস্থিতিতে তিনি মালিকানা স্বত্ত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়বেন।

এটি স্পষ্ট যে, অনর্থক স্রষ্টার ওপর সৃষ্টির কোন অধিকার আছে বলে যদি মনে করা হয় তাহলে এমন এক ধারার সূচনা হবে যেখানে দাবী-দাওয়ার কোন অন্তঃ নেই; কেননা, স্রষ্টা কোন সৃষ্টিকে মানগত যে অবস্থান দিয়েই সৃষ্টি করুন না কেন, সে পর্যায়ে সেই সৃষ্টি হয়ত বলতে পারে যে, আমার অধিকার এর চেয়েও বেশি! আর খোদা তা'লা যেহেতু অনন্ত মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন আর তাঁর সীমাহীন কুদরত বা শক্তির বিদ্যমানতায় শুধু মানুষ বানিয়েই সৃজনী শ্রেষ্ঠত্বের সমাপ্তি ঘটে না, এমন পরিস্থিতিতে সৃষ্টির দাবি-দাওয়া কোনদিন সমাপ্ত হবে না আর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর নিজের প্রাপ্য দাবী করায় এক অনন্ত-অসীম অধিকার সেই সৃষ্টির অর্জন হবে; আর অন্তহীন দাবী-দাওয়া বলতে এটিই বুঝায়।

অবশ্য যদি এটি জানার আগ্রহ থাকে যে, পদমর্যাদার ভিন্নতার পেছনে প্রজ্ঞা কী? তাহলে জেনে রাখা উচিত, পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে তিনটি প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে, যা যুক্তি ও বিবেকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান; কোন বিবেকবান তা অস্বীকার করতে পারে না। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রধানতঃ ইহজাগতিক বিষয়াদি, অর্থাৎ সামাজিক বিষয়াদি যেন সর্বোত্তমভাবে সম্পাদিত হয়; যেমনটি তিনি বলেন,

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣٢﴾
اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٣﴾

(সূরা আয্ যুখরুফ: ৩২-৩৩)

অর্থাৎ কাফিররা বলে, এই কুরআন মক্কা ও তায়েফের বড় বড় সম্পদশালী ও সর্দারদের মধ্য হতে কোন বড় মাতব্বর ও ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রতি কেন নাযিল হল না? এমনটি হলে তা তার নেতাসুলভ মর্যাদার প্রতি সুবিচার হতো এবং একইসাথে তার প্রতাপ-প্রভাব, উত্তম ব্যবস্থাপনা ও অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই ধর্মের প্রসার ঘটতো।

এক দরিদ্র মানুষকে কেন এই স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হলো, যার কাছে জাগতিক সম্পদ বলতে কিছুই নেই ? (এরপর উত্তর স্বরূপ বলেছেন), 'আ হুম ইয়াকসিমুনা

রাহমাতা রাব্বিকা' (সূরা আয্ যুখরুফ: ৩৩) অনাদি-অনন্ত বন্টনকারী খোদার রহমত বা করুণা বন্টনের কোন অধিকার তাদের আছে কি? অর্থাৎ এটি প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদা তা'লার কাজ যে, তিনি কিছু মানুষকে সামান্য ও সীমিত সামর্থ্য দিয়েছেন, জাগতিক চাকচিক্যের জালে যারা আবদ্ধ হয়ে যায়, সর্দার ও সম্পদশালী আখ্যায়িত হওয়া নিয়ে অহংকারে মত্ত হয় কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে বসে। কিছু মানুষকে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় ভূষিত করেছেন। তারা সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়েছেন আর এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রিয়ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

(এরপর সামর্থ্যের তারতম্য ও চিন্তাধারার পার্থক্যের মাঝে যে প্রজ্ঞা নিহিত আছে, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন), 'নাহনু কাসামনা বাইনাহুম মায়িশাতাহুম' (সূরা আয্ যুখরুফ: ৩২) অর্থাৎ আমরা তাদের মাঝে কিছু মানুষকে সম্পদশালী করেছি আর কিছু মানুষকে করেছি দরিদ্র, কতককে সূক্ষ্ম-সুন্দর প্রকৃতি-সম্পন্ন আর কতককে স্থুল স্বভাবের , কিছু মানুষকে আকৃষ্ট রেখেছি কোন পেশার প্রতি আর অন্যদের ভিন্ন পেশার প্রতি, যেন তাদের কতক অন্যদের জন্য সহযোগী ও সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। কেবল একজনের ওপর যেন বোঝা না চাপে, আর এভাবে মানব জাতির গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে থাকে।

আবার বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে জাগতিক ধন-সম্পদের চেয়ে খোদার কিতাব বা ঐশীগ্রন্থ অধিক উপকারী। তিনি ইলহামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মানুষ সামাজিক জীব, পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত তার কোন কাজ সমাধা হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রুটির কথাই ভাবুন! যাকে কেন্দ্র করে জীবন। এটি বানানোর জন্য কতটা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়! চাষবাসের জন্য কষ্টসাধ্য-শ্রম থেকে আরম্ভ করে রুটি প্রস্তুত হয়ে খাওয়ার যোগ্য হওয়া পর্যন্ত বহু পেশাজীবির সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অতএব এটি থেকে বুঝা যায় যে, দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার কতটা প্রয়োজন!

এই চাহিদা পূরণের জন্য মূর্তিমান প্রজ্ঞা-খোদা তা'লা আদম সন্তানদের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতি ও যোগ্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রকৃতিগত আকর্ষণ অনুসারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করে। যেমন কেউ ক্ষেত-খামার করবে, কেউ কৃষি-যন্ত্রপাতি বানাবে, কেউ আটা পিষবে, কেউ পানি আনবে, কেউ রুটি পাকাবে, কেউ সূতা বুনবে, কেউ কাপড় বানাবে, কেউ দোকান খুলবে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপকরণ সৃষ্টি করবে, কেউ বা চাকরী করবে আর এভাবে একে অন্যের সহযোগী হিসেবে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাবে। অতএব, পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা যেখানে আবশ্যক, সেখানে পরস্পরের মাঝে লেনদেনও আবশ্যক হয়ে গেল। আর লেনদেন ও আদান-প্রদানের কাজে যখন জড়িয়ে গেল, তখন ঔদাসীন্যও ঘাড়ে ভর করল, যা বৈষয়িক কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার সহজাত ফলাফল।

এমতাবস্থায়, তাদের ন্যায়বিচার-সংক্রান্ত এমন একটি আইনের প্রয়োজন পড়ল, যা তাদেরকে অন্যায়-অবিচার, বিদ্বেষ, নৈরাজ্য ও খোদা সম্পর্কে ঔদাসীন্য হতে সুরক্ষা দিবে, যেন বিশ্ব-ব্যবস্থায় কোন বিপত্তি-বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়। কেননা, জীবন-জীবিকা ও পারলৌকিক বিষয়াদী সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ন্যায়বিচার ও খোদাপ্রেমের ওপর। আর ন্যায়-বিচার ও খোদাভীতি বিধি-বিধানভুক্ত একটি ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে, যাতে ন্যায়-বিচারের সূক্ষ্মতা ও খোদাকে চেনা-সংক্রান্ত নিগূঢ় রহস্যাবলী নিখুঁত ভাবে উল্লেখিত থাকা বাঞ্ছনীয়। ভুলবশতঃ বা জ্ঞাতসারে কোন প্রকার অন্যায় বা ভ্রান্তি যেন তাতে না থাকে। আর এমন আইন কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই উৎসারিত হতে পারে, যার সত্তা ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায়-অবিচার হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং একইসাথে নিজ সত্তায় সে হবে, আনুগত্য ও সম্মানলাভের একচ্ছত্র অধিপতি।

কেননা, কোন আইন উত্তম হলেও আইন প্রয়োগকারী যদি নিজের মর্যাদার নিরিখে অন্য সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও রাজত্ব করার অধিকার না রাখে, বা মানুষের দৃষ্টিতে যদি সে সর্বপ্রকার অন্যায়, নোংরামি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র না হয়, তাহলে এমন আইন প্রধানত চলতেই পারে না আর কিছুদিন চললেও স্বল্প সময়ের ভেতরই বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য-অনিয়ম দেখা দেয় এবং কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্ণিত এসব কারণে ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেননা, সকল পূত-পবিত্র বৈশিষ্ট্য এবং সকল প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য কেবল খোদার গ্রন্থেই পাওয়া যায়, এর বাইরে নয়।

দ্বিতীয়তঃ পদমর্যাদায় তারতম্যের আরো একটি কারণ হলো, পুণ্যবান ও পবিত্রদের গুণাবলী বা সৌন্দর্য প্রকাশ করা– কেননা; প্রত্যেক শ্রেষ্ঠত্ব তুলনার নিরিখেই প্রকাশ পায়। যেমন, তিনি বলেছেন,

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝٨

(সূরা আল্ কাহাফ:৮)

অর্থাৎ, ধরাপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সে সবকে আমরা পৃথিবীর ভূষণের মর্যাদা দিয়েছি যেন পাপীদের সাথে তুলনার নিরিখে যারা পুণ্যবান, তাদের পুণ্য ও যোগ্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে আর স্থুলকে দেখে 'সূক্ষ্ম'-র সূক্ষ্মতা উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়।

বস্তুর প্রকৃত রূপ বৈপরীত্যের উপস্থিতিতে শনাক্ত করা যায়- পুণ্যবানদের মূল্য ও

মর্যাদা পাপীদের সাথে তুলনা করলেই জানা যায়।

তৃতীয়তঃ পদমর্যাদার ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টির কারণ হলো, বিভিন্ন প্রকার শক্তি বা ক্ষমতার প্রকাশ ঘটানো আর স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। যেমন, তিনি বলেছেন,

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿١٤﴾
وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿١٥﴾

(সূরা নূহ: ১৪-১৫)

অর্থাৎ, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা খোদার মাহাত্ম্য স্বীকার কর না? অথচ স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

অর্থাৎ প্রজ্ঞার মূর্ত প্রতীক খোদা, বিভিন্ন যোগ্যতা ও বিভিন্ন প্রকৃতির (মানুষের) মাঝে যে পার্থক্য রেখেছেন, এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞা যেন স্বীকৃত হয়।

যেমন, অন্যত্র তিনি বলেছেন

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٦﴾

(সূরা আন্ নূর: ৪৬)

অর্থাৎ সব জীবকে খোদা তা'লা পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কিছু প্রাণী পেটে ভর করে চলে আর কিছু ভর কওে দু'পায়ের ওপর, কিছু আবার চার পায়ের ওপর ভর করেও চলে; খোদা যা চান সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বশক্তিমান। এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, খোদা এসব প্রাণীকুল সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিভিন্ন কুদরত বা শক্তিমত্তা প্রকাশের জন্য। এক কথায়, সৃষ্টির মাঝে প্রকৃতিগত যে ভিন্নতা রয়েছে, সেক্ষেত্রে ঐশী প্রজ্ঞা সেই তিনটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ, যা আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করেছেন; অতএব মাথা খাটাও আর প্রণিধান কর।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

এযালায়ে আওহাম

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৪৩তম কিস্তি)

কেউ যদি এই সংশয় সৃষ্টি করতে চায় যে, হযরত মসীহ্ তো ইঞ্জিলে বলেন, 'অবশ্য-অবশ্যই আমি মারা যাব, তবে তৃতীয় দিনেই আমি জীবিত হয়ে উঠবো।' অতএব আপনার উপরুল্লিখিত বর্ণনা কী করে এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে? এর উত্তর হলো, হযরত মসীহ্‌র এই মারা যাওয়া বলতে প্রকৃ মৃত্যু বুঝায় না, বরং এটি রূপকার্থে মৃত্যু বুঝায়। এটি এক সাধারণভাবে প্রচলিত বাকভঙ্গী, যে-ব্যক্তি মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েও বেঁচে যায় তার সম্পর্কেও বলা যায় যে, সে নতুনভাবে পুনরায় জীবিত হয়েছে। হযরত মসীহ্‌র ওপর যে মহাবিপদ আপতিত হয়, এতে তাঁকে ক্রুশে চড়ানো হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পেরেক ঠুকে দেয়া হয়। এর দরুন তিনি মুর্ছিত অবস্থায় উপনীত হন। এ বিপদ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম কিছু নয় এবং সাধারণভাবে কথাবার্তায় এরকম বিপদে পড়ে যে-ব্যক্তি রক্ষা পায় তার সম্পর্কে এটাই বলা হয় যে, সে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। সে যদি বলে, 'আমি তো নতুন ভাবে জীবিত হয়েছি' তাহলে তার একথা কোনো মিথ্যা বা অতি রঞ্জিত বলে মনে করা হয় না।

আর যদি প্রশ্ন করা হয়, হযরত মসীহ্‌র উক্ত বাক্যটিতে উল্লিখিত মৃত্যু দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু নয়, তবে তাঁর ভাষায় এর বিশেষ কী কারণ বা প্রমাণ রয়েছে? এর উত্তর হলো, এ কারণটিও স্বয়ং হযরত মসীহ্ ব্যক্ত করেছেন। অতএব ইহুদীদের বিচক্ষণ উলামা ও মুফ্‌তি সবাই একত্র হয়ে যখন তাঁর কাছে প্রশ্ন করলো, 'আপনি মসীহ্ হবার দাবী তো করেছেন কিন্তু কোন মুজিযা ছাড়া এ দাবী আমরা কী করে মেনে নেব?' তখন হযরত মসীহ্ তাদের এই উত্তর দেন, 'এ যুগের হারাম কার্যে লিপ্ত লোক আমার কাছে মু'জিযা চায়, কিন্তু ইউনুস নবীর মু'জিযা ছাড়া তাদের অন্য কোনো মু'যিজা দেখানো হবে না।' অর্থাৎ এই মু'যিজা দেখানো হবে যে ইউনুস নবী যেভাবে মাছের পেটে জীবিত থাকেন এবং মারা যান নি, সেভাবেই হযরত মসীহ্‌ও ঐশী কুদরতের দরুন মাটিগর্ভে তিন দিন অবধি জীবিতাবস্থায় থাকবেন এবং মারা যাবেন না।

এখন লক্ষ্য করা আবশ্যক যে হযরত মসীহ্‌র উল্লিখিত বাক্যটিতে যদি আক্ষরিক অর্থে প্রকৃত মৃত্যু বলে ধরা হয় তাহলে হযরত ইউনুসের সাথে সাদৃশ্যমূলক এই মু'জিযা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে। কেননা হযরত ইউনুস মাছের পেটে জীবিত অবস্থায় ছিলেন, মৃতাবস্থায় ছিলেন না। কাজেই হযরত মসীহ্ যদি মারা গিয়েছিলেন এবং মৃতাবস্থায় তাকে মাটিগর্ভে (গুহায়) রাখা হয়ে থাকে তাহলে ইউনুসের এ ঘটনার সাথে হযরত মসীহ্‌র ঘটনার কী-বা সাদৃশ্য এবং মসীহ্‌র ঘটনার সাথে হযরত ইউনুসের ঘটনার কি-বা সম্পর্ক? আর জীবিতের সাথে মৃতের কী সাদৃশ্য হতে পারে!? অতএব হযরত মসীহ্ তিন দিন পর্যন্ত মারা যাবেন না বলে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বক্তব্যটি যে আক্ষরিক অর্থে ধর্তব্য নয় বরং এর দ্বারা রূপক অর্থে মৃত্যু বুঝায়, উপরুল্লিখিত বর্ণনাটি তার যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট কারণ হিসেবে

সাব্যস্ত। আর রূপক অর্থে মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুটি ছিল তাঁর মুর্ছিত অবস্থায় উপনীত হওয়া।

আর যদি এ ওজর বা আপত্তি উপস্থাপন করা হয় যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় এ-ও বলেছিলেন, 'আজ আমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবো'। অতএব তাঁর এ বাক্যটি দ্বারা স্পষ্টত মসীহ্‌র মারা যাওয়া প্রমাণিত হয়। কাজেই স্পষ্ট হোক, হযরত মসীহকে অবশ্যই বেহেশ্‌তে যাওয়ার এবং খোদা তা'লার সকাশে ও সন্নিধ্যে ওঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু এর পূর্ণতা পরবর্তী অন্য কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল– যা মসীহ্ (আ.)-এর প্রতি তখনও প্রকাশ করা হয় নি। যেমন, কুরআন করীমে **"ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফিকা ওয়া রাফিউকা"**– বর্ণিত আছে। অতএব অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সময়ে হযরত মসীহ্ ভেবেছিলেন, সম্ভবত 'আজই' ওই প্রতিশ্রুতি পুরো হবে। মসীহ্ (আ.) যেহেতু মানুষ ছিলেন এবং প্রত্যক্ষ করেন, তাঁর মৃত্যুবরণের সব উপকরণ দৃশ্যত উপস্থিত। কাজেই তিনি বাহ্যিক পরিস্থিতি দৃষ্টে ধারণা করেন, সম্ভবত 'আজই' মারা যাবেন। অতএব ভীতিপ্রদ ঐশী জ্যোতির্বিকাশবশত বর্তমান অবস্থা দেখে তাঁর ওপর মানবসূলভ দুর্বলতা প্রবল হয়েছিল। তাই তিনি অতিষ্ঠ ও অস্থির হয়ে বলেন, 'এলি; এলি লিমা সাবাক্তানি?'–'হে আমার খোদা! হে আমার খোদা! কেন আমায় তুমি ছেড়ে দিলে? কেন সেই প্রতিশ্রুতি পুরো করলে না, যা তুমি পূর্বাহ্নে দান করেছিলে?' এ মর্মে প্রতিশ্রুতি ছিল যে, 'তুমি মারা যাবে না। বরং ইউনুসের মতো তোমার অবস্থা হবে।'

যদি বলা হয়, 'খোদা তা'লার সুরক্ষামূলক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ কেন সন্দেহ করলেন?' অতএব জানা আবশ্যক, উল্লিখিত সন্দেহ মানবসুলভ দুর্বলতার কারণবশত। ঐশী প্রতাপপূর্ণ জ্যোতির্বিকাশের সম্মুখে মানবীয় সত্তা কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। প্রত্যেক নবীকে খোদা তা'লা এই দিন দেখান। প্রথমে তিনি তাঁর নবীকে সুসংবাদবহ কোনো প্রতিশ্রুতি দান করে থাকেন। এরপর যখন সে-নবী সেই প্রতিশ্রুতিতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তখন পরীক্ষাস্বরূপ চতুর্দিক এরকম বাধা-বিঘ্ন দাঁড় করিয়ে দেন যা চূড়ান্ত পর্যায়ে সুনিশ্চিত নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতার বার্তা দেয়। যেমন, খোদা তা'লা একদিকে তো আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বদরের যুদ্ধে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দান করেন। আর অন্যদিকে যুদ্ধের সময় যখন উপস্থিত হলো তখন জানা গেল, বিরুদ্ধ পক্ষের এত বিপুল জনবল ও সমরশক্তি রয়েছে যে, দৃশ্যত সাফল্যের আশা নেই। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অতীব অস্থির ও আতংকিত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! এ জামাতটিকে জয়যুক্ত কর। (মুষ্টিমেয় হলেও) এদের যদি তুমি বিজয় দান না কর এবং এদের তুমি ধ্বংস হতে দাও, তাহলে কিয়ামত অবধি কেউ তোমার ইবাদতকারী হবে না।' অতএব এ শব্দাবলী প্রকৃতপক্ষে একথার প্রমাণ বহন করে না যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বরং বর্তমান পরিস্থিতিকে আশার পরিপন্থী দেখে তার দৃষ্টি খোদা তা'লার অ-মুখাপেক্ষীতা বোধের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি ঐশী-ভীতিপ্রদ প্রতাপে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমের এমন প্রত্যেক জায়গায় যেখানে বালা হয়েছে, 'তুমি আমার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সন্দিহান হবে না'– সে সব জায়গা এ রকমই, যেখানে দৃশ্যত ভীষণ অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল এবং বিরূপ উপকরণ ভীষণ ভীতিপ্রদ চেহারা দেখাচ্ছিল, যা দেখে প্রত্যেক মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে বিচলিত হয়ে ওঠে। অতএব এসব সঙ্কটময় সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সান্তনা প্রদানস্বরূপ বলা হয়েছে, যদিও পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক, কিন্তু মানবীয় দুর্বলতার দরুন সন্দেহ করো না অর্থাৎ এ ধারণা করো না যে, সম্ভবত এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য কোনো অর্থ হবে।

এ পুস্তক প্রণেতা এরকম উপলক্ষে নিজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। প্রায় তিন বছর কাল অতিবাহিত হয়েছে, কতিপয় গুরুতর কারণ বশত– যেগুলো সবিস্তারে ১০ জুলাই, ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ইশতিহারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। খোদা তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ এ অধমের প্রতি প্রকাশ করেন যে, হুশিয়ারপুর নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ (পিতা মির্যা গামা বেগ)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা (চরম বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও) 'অবশেষে তোমার বিবাহ-বন্ধনে আসবে'। তারা অনেক শত্রুতা প্রদর্শন করবে। বহু চেষ্টা করবে যাতে এ বিবাহ না হয়। অনেক বাধা আসবে। কিন্তু পরিশেষে তেমনটিই হবে। আল্লাহ্ জ্ঞাত করেন, খোদা তা'লা সবদিক দিয়ে তাকে –কুমারি বা বিধবা অবস্থায় হোক, তোমার দিকে আনয়ন করবেন। সব প্রতিবন্ধকতা তুলে দেবেন এবং একাজ অবশ্যই পুরো করবেন। কেউ একে ঠেকাতে পারবে না। সুতরাং এ ভষ্যিদ্বাণীর বিস্তারিত বিবরণ– এর বিশেষ নির্ধারিত মেয়াদ এবং এর সংশ্লিষ্ট শর্তাবলীসহ ১০ই জুলাই ১৮৮৮-এর ইশতিহারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এসব কারণে এটি মানবীয় ক্ষমতাতীত হিসেবে প্রতিপন্ন ও বিবেচিত। এ ইশতিহারটি সাধারণ ভাবে প্রচারিত হয়েছে। এর সম্পর্কে আর্যসমাজী হিন্দুদের কতিপয় ন্যায়বিচার স্বভাব সম্পন্ন লোকজনও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটি খোদা তা'লার কাজ ও ঐশী-নিদর্শন বটে। আর এ ভষ্যিদ্বাণীটি কঠিন এক বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী বা জাতির মোকাবিলায় উপস্থাপিত। তারা শত্রুতা ও বৈরিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত প্রত্যেক ব্যক্তি এ ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করবে। আমি এ ভবিষ্যদ্বানীটি এ জায়গায় এজন্য সবিস্তারে লিখিনি যাতে বারবার এর পটভূমি ও উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করার দরুন এ ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত কেউ মর্মাহত না হন! কিন্তু যে ব্যক্তিই এ সম্পর্কিত ইশতিহারটি পাঠ করবে – সে যতই গোঁড়া ও বৈরী মনোভাবপন্ন হোক না কেন, তাকে স্বীকার করতে হবে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু (এবং পরবর্তীতে এর অলৌকিক প্রতিফলন) মানবীয় ক্ষমতা বহির্ভূত এবং এ কথার পরিপূর্ণ ও নিরুত্তরমূলক উত্তরও পেয়ে যাবে যে, খোদা তা'লা কেন এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণনা করলেন, এর মাঝে কী কল্যাণাবলী নিহিত এবং কোন্ দলিল বা যুক্তি প্রমাণে এটি মানবীয় ক্ষমতাতীত এক ঐশী-নিদর্শন।

এখন উপরুল্লিখিত বিষয়টি লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমাকে জানানো হলো এবং তখনও এটি পুরো হয়নি (যেমন এখনও ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্তও পুরো হয়নি)। এরপর এ অধম ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে অবস্থা প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়, বরং মৃত্যু সম্মুখে দেখে শেষ ওসীয়্যতও সম্পাদন করা হলো। তখন ভবিষ্যদ্বাণীটি যেন চোখের সামনে এসে গেল। আর মনে হচ্ছিল, এখনই শেষ নিঃশ্বাস উপস্থিত এবং আগামী কাল জানাযা বের হবে। সেই মুহূর্তে আমি উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটির সম্পর্কে খেয়াল করলাম যে, সম্ভবত এর অন্য কোনো অর্থ হবে, যা আমি বুঝতে পরি নি। তৎক্ষণাৎ সেই মৃত্যুলগ্ন অবস্থায় আমার প্রতি ইলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হলো : **"আল-হাক্কু মির্-রাব্বিকা ফালা তাকুনান্না মিনাল মুম্‌তারীন"** অর্থাৎ 'একথাটি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত ধ্রুব সত্য। অতএব কেন সন্দেহ কর?' কাজেই তখন আমার কাছে এই গোপন রহস্যপূর্ণ তত্ত্বটি উন্মোচিত হলো যে খোদা তা'লা তাঁর রসূলদের কেন একথা বলেন যে 'তুমি সন্দিহান হয়ো না'। অতএব আমি অনুধাবন করলাম যে প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি এরকম নাজুক সময়ের সাথেই সম্পৃক্ত যেমন সংকীর্ণ ও নৈরাশ্যজনক এ মুহূর্তটি আমার ওপর আপতিত বিপদের সময়েই উপস্থিত হয়, যেমনটি আমার ওপর এসেছে। তখন খোদা তা'লা তাদের অবিচল বিশ্বাসে উজ্জীবিত করানোর উদ্দেশ্যে বলেন, 'তুমি কেন সন্দেহ করছো?। বিপদ তোমাকে নিরাশ করলেও তুমি নিরাশ হয়ো না।' (চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

[৩ পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতায় টিকার অবশিষ্টাংশ]

মহানবী (সা.) তাঁর বেহেশতে আরোহণের কথা যদি বলতেন তাহলে উম্মে হানী তাঁর একাধিক বর্ণনার কোন একটিতে অন্তত এ বিষয়ের উল্লেখ না করে পারতেন না। কিন্তু তিনি তার কোন রেওয়ায়াতেই একথা উল্লেখ না করায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, যে রাতে নবী করীম (সা.) কেবল ইসরা বা জেরুযালেমে আধ্যাত্মিক সফর করেছিলেন, সেই রাতে মে'রাজ সংঘটিত হয় নি। মনে হয় কোন কোন বর্ণনাকারী ইসরা ও মে'রাজ –এ দু'টি বিষয়কে এক করে ফেলেছিলেন। এ গরমিল সম্ভবত ইসরা' শব্দ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ শব্দটি 'ইসরা' এবং মে'রাজ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইসরা ও মে'রাজের বিবরণের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এ বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায় এবং বদ্ধমূল হয়ে যায়। (গ) যেসব হাদীস প্রথমে মহানবী (সা.)-এর জেরুযালেম সফর এবং সেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকে তাঁর পরিভ্রমণের বিবরণ দিয়েছে, সেগুলোতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) জেরুযালেমে পূর্ববর্তী যে নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত আদম, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.), কিন্তু বেহেশতেও পুনরায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অথচ সেখানে তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন নি। কাজেই প্রশ্ন জাগে, এই নবীগণ (আ.) যাঁদের সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর জেরুযালেমে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে তারা কিরূপে তাঁর পূর্বে বেহেশতে পৌঁছে গেলেন এবং একই সফরে কিছুক্ষণ পূর্বে যাদেরকে দেখেছিলেন তাঁদেরকে তিনি কেন চিনতে পারলেন না? এটা কল্পনা করা যায় না যে, উল্লিখিত সফরের মাঝে মাত্র মহানবী (সা.) অল্পক্ষণ পূর্বেই যাঁদেরকে দেখেছিলেন, খানিক পরেই তিনি তাঁদেরকে চিনতে ব্যর্থ হলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী" পৃ: ১৪০৪-১৪০৯।

১৫৯১। মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) দিয়ে জেরুযালেমে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইবাদত গৃহের কথা বলা হয়েছে।

১৫৯১-ক। তফসীরাধীন আয়াতে বর্ণিত নবী করীম (সা.)-এর কাশফ এর মধ্যে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে। দূরবর্তী মসজিদে তাঁর ভ্রমণ দ্বারা মদীনায় প্রত্যাবাসন এবং সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করার ইঙ্গিত বহন করেছে, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় মসজিদরূপে নির্ধারিত হবে। কাশফে মহানবী (সা.) নামাযে অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করেছিলেন এর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে নতুন ধর্ম ইসলাম এর জন্মস্থানেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকার জন্য প্রবর্তিত হয় নি, বরং এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এবং অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হবে। কাশফে জেরুযালেম গমন দিয়ে এও ব্যক্ত হতে পারে যে তাঁকে (সা.) সেই অঞ্চলের আধিপত্য দান করা হবে যেখানে জেরুযালেম অবস্থিত। এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় পূর্ণ হয়েছিল। এ কাশফ দিয়ে ভবিষ্যতে কোন দূরবর্তী দেশে মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সফরের ইঙ্গিতরূপেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর অর্থ যখন আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকার সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন নবী করীম (সা.)-এর কোন অনুগামীর মাঝে তাঁরই আত্মিকরূপে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটবে তাঁর প্রথম আবির্ভাবের ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরের কোন অঞ্চলে। মহানবী (সা.)-এর এই দ্বিতীয় রূহানী আবির্ভাব প্রসঙ্গে সূরা জুমুআর ৩-৪ আয়াতে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

** [কুরআন শরীফে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর দু'টি আত্মিক সফরের উল্লেখ রয়েছে। একটিকে 'ইসরা' আর অপরটিকে 'মে'রাজ' বলা হয়। 'ইসরা-র সফরে তাঁকে প্যালেস্টাইনের 'বায়তুল মুকাদ্দাস' দেখানো হয়েছিল। এতে তাঁর প্যালেস্টাইনে দৈহিক সফর প্রমাণিত হয় না বরং এতে তাঁর আত্মিক সফর বুঝানো হয়েছে। তাই এক ব্যক্তি প্যালেস্টাইনের অমুক ভবনের আকৃতি কী রকম জানতে চাইলে হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী সেই মুহূর্তে মহানবী (সা.)-এর চোখের সামনে সেই ভবনের দৃশ্য তুলে ধরা হয় আর তিনি (সা.) সেই দৃশ্য দেখে দেখে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী লাম্মা কাযযানী কুরাইশু কুমতু ফিল হিজরে ফা জাল্লাল্লাহু লী বায়তাল মাকদিস ফাতফিকতু উখবিরহুম আন আয়াতিহি ওয়া আনা আনযুরু ইলাইহি অর্থ : যখন কুরায়শরা মেরাজের ঘটনায় আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে লাগলো, তখন আমি হিজরে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তা'লা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তা দেখে দেখে এর সকল চিহ্ন তাদের বলতে থাকলাম। (বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা বনী ইসরাঈল)।

জুমুআর খুতবা

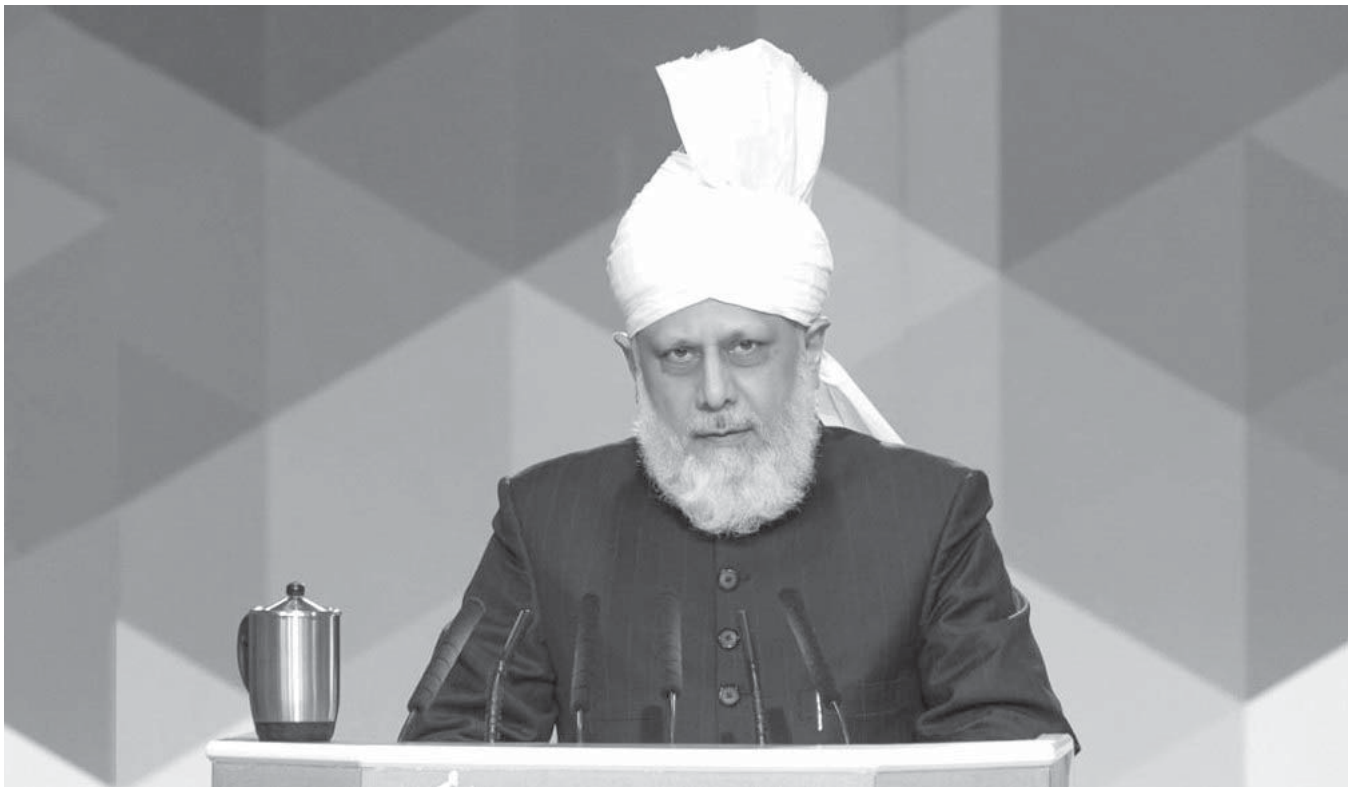

“মুসলেহ্ মওউদ হবার ঘোষণার প্রেক্ষাপট”

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ১৭ তবলীগ ১৩৯৬ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আহমদীয়া জামা’তে ২০ ফেব্রুয়ারি দিনটি মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। যেভাবে আমরা জানি, এটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এক মহান সন্তান লাভের শুভ-সংবাদ দেয়া হয়েছে, যার মাঝে রয়েছে বহু বিশেষত্ব আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হওয়ার খবর এবং এতে তার দীর্ঘজীবি হওয়ার সংবাদও রয়েছে আর মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা’তের অসাধারণ উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণীও এতে ছিল। জামা’তে আহমদীয়ার ইতিহাস এর সাক্ষী যে, হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আল মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ৫২ বছরের অধিক দীর্ঘ খিলাফতকালে এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি অংশ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। ন্যায়পরায়ণ এবং আধ্যাত্মিকভাবে দৃষ্টি সম্পন্ন এক ব্যক্তি জন্য এই একটিমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার অনেক বড় প্রমাণ। তিনদিন পরই ২০ ফেব্রুয়ারি আসছে। এ প্রেক্ষাপটে আমি আজ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নিজের ভাষায় বর্ণিত কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা পূর্ণ-সত্যের মর্যাদা লাভের প্রেক্ষাপটে তাঁর

কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা বলে নিজের ভ্রান্ত দাবিকে প্রমাণিতও করে এবং নিজের ধূর্ততা ও চালাকির মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রাধান্যও বিস্তার করে, তবুও সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সম্মান পেতে পারে না। আর খোদার সন্নিধানে যে সম্মানিত নয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে যতই সম্মানিত হোক না কেন, কিছু না কিছু সে অবশ্যই হারিয়েছে, অর্জন কিছুই করে নি। আর অবশেষে সে একদিন অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

সত্তায় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি আলোকপাত করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কে ১৯১৪ সনে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের আসনে আসীন করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যক্তি সত্তায় মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটি কথার পূর্ণতা তখনকার মানুষের চোখে পড়ত। আর জামা'তের আলেম ও সাধারণ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণিই এটি বুঝত যে, তিনিই মুসলেহ্ মওউদ। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্বয়ং কখনো এটি ঘোষণা করনে নি। ১৯৪৪ সাল পর্যন্তও তিনি এ সংক্রান্ত ঘোষণা দেন নি। অর্থাৎ, তাঁর খিলাফতের ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ' অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত সংস্কারক। একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, এ ঘোষণা দেয়া এবং স্বপ্নের বিশদ বিবরণও তুলে ধরা প্রকৃতিগতভাবে আমার জন্য অনেক কঠিন কাজ। বরং তিনি অনেক স্থানে বলেছেন, আমার স্বভাব ও প্রকৃতিগতভবে আমি আমার স্বপ্ন এবং এলহাম বলতে দ্বিধা বোধ করি। কিন্তু কোন কোন পরিস্থিতির নিরিখে কিছু কথা বলতেও হয়। যাহোক, পূর্বেও জামা'তের সদস্য এবং আলেমদের পক্ষ থেকে বলা হতো যে, আপনি ঘোষণা দিন, আপনি-ই মুসলেহ্ মওউদ। কিন্তু তিনি শুধু এ উত্তরই প্রদান করতেন যে, ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আমিই যদি মুসলেহ্ মওউদ হয়ে থাকি আর মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সত্তায় পূর্ণতা লাভ করে, তাহলে কোন দাবির প্রয়োজন নেই। মানুষের কথার উত্তর দিতে গিয়ে একবার তিনি এটিও বলেছেন, উম্মতে মুসলেমায় মুজাদ্দেদের যে তালিকা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেখানোর পর ছাপানো হয়েছে, তাদের মাঝে ক'জন এমন আছেন, যারা দাবি করেছেন?

তিনি বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি যে, আমার কাছে আওরঙ্গজেবকেও স্বীয় যুগের মুজাদ্দেদ মনে হয়, কিন্তু তিনি কি কখনো দাবি করেছেন? ওমর বিন আব্দুল আযীযকে মুজাদ্দেদ বলা হয়, এমন কোন দাবি তার রয়েছে কি? তিনি বলেন, যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট নন, তাদের জন্য দাবি করা আবশ্যক নয়। শুধু ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত প্রত্যাদিষ্টদের দাবি করা আবশ্যক হয়ে থাকে। যারা প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। যদি কাজের পূর্ণতা লাভ করতে দেখা যায়, তবে তার দাবির প্রয়োজন কী? এমন ক্ষেত্রে সে যদি অস্বীকারও করে, তবে আমরা বলব যে, তিনিই এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণ-প্রকাশস্থল। ওমর বিন আব্দুল আযীয মুজাদ্দেদ হওয়ার কথা অস্বীকার করলেও আমরা বলতে পারতাম যে, তিনি স্বীয় যুগের মুজাদ্দেদ। কেননা, মুজাদ্দেদের জন্য কোন দাবি করার প্রয়োজন নেই। দাবি করা শুধু সে সব মুজাদ্দেদের জন্য আবশ্যক, যারা মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট। অবশ্য প্রত্যাদিষ্ট নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের নির্দেশাবলীকে দাঁড় করায়, শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে, এমন ক্ষেত্রে তার যদি এটি জানা না-ও থাকে যে, তিনি মুজাদ্দেদ, তবে আমরা বলতে পারি যে, তিনি মুজাদ্দেদ। হ্যাঁ! প্রত্যাদিষ্ট মুজাদ্দেদ কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি দাবি করবেন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, অতএব, আমার পক্ষ থেকে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করার কোন প্রয়োজন নেই। আর বিরোধীদের এমন কথায় আমাদের বিচলিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই। এতে অসম্মানের কিছু নেই। প্রকৃত সম্মান সেটিই, যেটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়ে থাকে। এ পৃথিবীর দৃষ্টিতে মানুষ হীন বলে গণ্য হলেও মানুষ যদি খোদার শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করে, তাহলে খোদার দরবারে সে অবশ্যই সম্মানিত হবে। আর কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা বলে নিজের ভ্রান্ত দাবিকে প্রমাণিতও করে এবং নিজের ধূর্ততা ও চালাকির মাধ্যমে মানুষের মাঝে প্রাধান্যও বিস্তার করে, তবুও সে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সম্মান পেতে পারে না। আর খোদার সন্নিধানে যে সম্মানিত নয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে যতই সম্মানিত হোক না কেন, কিছু না কিছু সে অবশ্যই হারিয়েছে, অর্জন কিছুই করে নি। আর অবশেষে সে একদিন অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

তিনি (রা.) বলেন, অতএব, ধর্মীয় এবং জাগতিক কাজে সর্বদা সত্যকে অবলম্বন কর। তিনি (রা.) আরো বলেন, আল্লাহর খাতিরে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে সত্যিকার অর্থে কল্যাণের মাঝেই থাকে। এ প্রেক্ষাপটে নীতিগত একটি কথাও তিনি বর্ণনা করেছেন আর তা হল এই যে, সত্যের সাথে খোদা আছেন। আল্লাহ্ যাকে সত্য মনে করেন এবং খোদার ব্যবহারিক সাক্ষ্যের মাধ্যমেও তা প্রমাণিত হয়, তার জন্য দাবি করা বা ঘোষণা করা আবশ্যক নয়। হ্যাঁ! যদি খোদা তা'লা চান

যে, ঘোষণা করা হোক, সে ক্ষেত্রে ঘোষণাও হয়ে থাকে। কাজেই, কাউকে যদি যাচাই করতে হয় যে, তিনি খোদার ইচ্ছাধিনে কাজ করছেন কি-না বা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত কি-না? অর্থাৎ, ধর্মের কাজ হলে তা ঐশী সমর্থনের আয়নায় যাচাই করা উচিত। কিন্তু আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাকে বলেন, তুমি দাবি কর, তখন তিনি ঘোষণাও করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সামনে স্পষ্ট করেছেন, তাই আমি এখন ঘোষণাও করছি যে, আমি-ই মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণ স্থল। এই ঘোষণার পর জামা'তের সদস্যরা যেখানে আনন্দিত ছিল, সেখানে যারা লাহোরী বা গায়ের মোবাঈন, তারা আপত্তি করাও আরম্ভ করে। কাজেই, ১৯৪৫ সনের ২৭ তারিখে জলসা সালানার ২য় দিনের বক্তৃতায় এর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বিশেষভাবে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের প্রেক্ষাপটে কথা বলেছেন।

তিনি (রা.) বলেন, "যখন থেকে আমি মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছি, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব তেমনিভাবে আপত্তি করা আরম্ভ করে, যেভাবে সানাউল্লাহ্ সাহেব করতো। আমি স্বপ্ন বা ইলহাম শুনাই, খোদা তা'লার ইশারা বা ইঙ্গিতে যখন ঘোষণা করি, মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন স্বপ্ন বা ইলহামও উপস্থাপন করে না, আর উপস্থাপন করা তার জন্য সম্ভবও নয়। কেননা, তিনি নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে নিজের ত্রিশ বছরের পুরোনো একটি ইলহাম শুনাতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু তা-ও ঘটনাবলীর আয়নায় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু ইলহাম হয় নি, তাই ইলহাম উপস্থাপন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে! আপত্তি করা ছাড়া তার কাছে আর কিছুই নেই। আপত্তি-ই যদি না করেন, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কীভাবে করবেন? হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুদের জন্য এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল না যে, ইলহাম হয়-ই না। কেননা, তাদের পূর্বের নবীদের প্রতি ইলহাম হতো এবং তারা এ কথা মানতো। এ কারণে সেসব নবীদের অস্বীকারকারীরা এ সত্য অস্বীকার করতে পারতো না যে, ইলহাম বলতে কিছু নেই। নিজেদের কথা সত্য প্রমাণের জন্য, আর নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে এটি বলতো যে, এদের ইলহাম সব বানানো। অনুরূপভাবে, রসূল করীম (সা.)-এর শত্রুরাও এটিই বলেছে যে, তার সব ইলহাম বানানো। খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে যে, মহানবী (সা.)-এর ওহীও বানানো ছিল, আর আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমানের দাবি ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের প্রতি ইলহাম করা, যেন মিথ্যাবাদীদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে তাদেরকে ইলহাম থেকে বঞ্চিত রেখেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)-ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আর তাঁর শত্রু ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা দাড়িয়েছিল অন্যায়ের উপর। অনুরূপভাবে, মৌলভী মুহাম্মদ আলী আজকে বলে যে, আমার ইলহাম মিথ্যা, কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সত্য ইলহাম কেন করেন না, যাতে পৃথিবীবাসী জানতে পারে যে, মৌলভী সাহেব সত্যের উপর আর আমি মিথ্যার উপর।"

তিনি (রা.) বলেন, "আশ্চর্যের বিষয় হল, এক ব্যক্তি দিনরাত আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে আর তাঁর বান্দাদেরকে প্রতারণা আর ধোকার পথের দিকে দিবারাত্র ঠেলতে রত, অথচ খোদা তা'লা তা সত্ত্বেও আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন না। খোদার যদি আত্মাভিমান না হয়, তাহলে এর কারণ এটি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মৌলভী সাহেব তাঁর নৈকট্য থেকে বিতাড়িত। সেই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ইলহাম করেন নি। অতএব, সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ শুরু থেকেই সত্যকে অস্বীকার করে আসছে। আদি থেকেই এই ধারা অব্যাহত আছে, এবং এটি অব্যাহত থাকবে।" (আনওয়ারুল উলুম, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৪০-২৪১) অর্থাৎ সত্যের বিরোধিতায় তাদের এই আচরণ অব্যাহত থাকবে।

অতএব, আপত্তিকারীরা সদা-সবসময় আপত্তি করে আসছে। কিন্তু সেটিকে প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিছুই উপস্থাপন করতে পারে না। আর খোদা তা'লাকে সাক্ষী করে একথা বলা যে, 'আমরা খোদা তা'লাকে সাক্ষী করে নিজেদের ইলহাম এবং স্বপ্ন উপস্থাপন করছি'-এমনটি তারা বলতেও পারে না। কেননা, তারা জানে যে, ধরা পড়বে।

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু ইলহাম, দিব্যদর্শন এবং স্বপ্নের কথা উল্লেখ করছি, যা তিনি (রা.) মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ঘোষণা করার সময় বর্ণনা করেছিলেন-

তিনি (রা.) বলেন, "সর্বপ্রথম বিষয়, যা এই পদের দিকে ইঙ্গিত করে, তা হল আমার একটি ইলহাম, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় এটি আমার প্রতি নাযেল হয়েছে, আর আমি গিয়ে তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অবহিত করি। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর ইলহামের রেজিস্টারে বা খাতায় তা লিপিবদ্ধ করে নেন। সেই ইলহাম আমি বারবার শুনিয়েছি, (মানুষকেও তিনি অবহিত করেছেন)। প্রথমে আমি ভাবতাম যে, এটি শুধু খিলাফত সংক্রান্ত, কিন্তু এখন আমার চিন্তা এদিকে গিয়েছে যে, এই ইলহামে আমার সেই পদের দিকে ইঙ্গিত, যা খোদার পক্ষ থেকে আমার প্রাপ্ত হওয়ার ছিল। সেই ইলহাম হল,

'ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা', অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তোমার অনুসারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত জয়যুক্ত রাখবেন।" তিনি (রা.) বলেন, "এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে, (খুবই সূক্ষ্ম একটি ইশারা,) যা ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ধারাবাহিকতার ইঙ্গিত বহন করে আর তা হল, এটি সেই ইলহাম যা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যার কথা কুরআনে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অর্থাৎ কুরআনে শব্দ হল **'জাইলুল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা**

কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা' (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)। এখানে ইলহামের অংশ হল, **'ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা'**। এর কারণ হল, হযরত ঈসা (আ.)-এর দাবি ছিল মূসায়ী ধারার শেষ নবী হওয়ার। আর এমন দাবি সম্পর্কে পূর্ববর্তী লোকদের বিরোধিতা করা আবশ্যক হয়ে থাকে। একটি দীর্ঘকালের ব্যবধানে তারা সেই নবীর সত্তায় ঈমান আনে। কিন্তু মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যার সত্তায় পূর্ণ হওয়ার ছিল, তাকে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা খলীফা বানাতে চাইতেন, আর খলীফা হওয়ার অব্যবহিত পরেই এক পূর্বগঠিত জামা'ত পেয়ে যান, তাই এখানে **'যায়েলুল্লাযিনা'** সংক্রান্ত অংশের প্রয়োজন ছিল না। হযরত মসীহ্‌র পদ নিয়ে যে সমস্ত নবীরা পৃথিবীতে আসেন, তাদের দাবি শুনতেই মানুষ বলা আরম্ভ করে যে, মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী।

কিন্তু আবু বকরের (রা.) বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন মানুষ যদি হয়ে থাকে, সে যদি মেনে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। নতুবা সচরাচর এমন নবী যখন নবী হওয়ার দাবি করেন, সারা পৃথিবী তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়া আরম্ভ করে। স্বয়ং রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি প্রথম দিকে শুধু তিন ব্যক্তি ঈমান এনেছিল। কিন্তু খলীফা প্রথম দিনেই একটি পূর্বগঠিত জামা'ত পেয়ে যান। অতএব, **'ইন্নাল্লাযিনাত্তাবাউকা ফাউকাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা'** বলে আল্লাহ্ তা'লা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একদিন পূর্বগঠিত জামা'ত দান করবেন। আর এরপর তোমার সাথে এই জামা'তের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবেন। আর এক পর্যায়ে, রূপকভাবে তা তোমার জামা'ত বলে আখ্যায়িত হবে। আর কিছু মানুষ তোমার বিরোধিতাও করবে। কিন্তু তোমার হাতে বয়আতকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। আর এই বিজয় তোমার ইমামত হতেই আরম্ভ হয়ে যাবে, আর **'যায়েলুল্লাযিনাত্তাবাউকা'** অংশের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ তোমার অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে না যে, মানুষ কখন ঈমান আনবে, বা অধিকাংশ মানুষ যদি বিরোধিতা করে, ফতোয়া আরোপ করে, হাসি-ঠাট্টা করে, বিদ্রুপ করে, ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিরোধিতার তুফানও যদি উঠায়, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পূর্ব গঠিত জামা'তের সিংহভাগকে তোমার হাতে (অর্থাৎ মুসলেহ মওউদ) ন্যস্ত করবেন। আর যেদিন এই জামা'ত তোমার হাতে ন্যস্ত হবে, সেদিন থেকেই তোমার বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোমার মান্যকারীদের বিজয় লাভ হওয়া আরম্ভ হবে।"

তিনি (রা.) বলেন, "দেখ! এমনই হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর জামা'ত বিজয় লাভ করেছে তিন শত বছর পর, কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেছেন, তার কয়েক সপ্তাহের ভিতরই যারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হয়েছিল আর আমার পদের অস্বীকারকারী ছিল অর্থাৎ লাহোরী, খোদা তাদের বিরুদ্ধে আমাকে এবং আমার সাথীদেরকে বিজয় প্রদান করা আরম্ভ করেন। আর বিজয় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। লাহোরীরা আজকে বলছে যে, একটা স্বপ্নের উপর নির্ভর করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই স্বপ্ন, যার ভিত্তিতে মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা করেছেন। তারা বলে যে, এক স্বপ্নের ভিত্তিতে এই ঘোষণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অথচ সেটিও স্বপ্ন নয়, কেননা, তাতে নির্দিষ্ট শব্দমালা ছিল। কিন্তু উপরে আমি যে ইলহাম লিখেছি, এই ইলহাম ছিল আমার প্রতি। আর এটি চল্লিশ বছর পুরোনো। আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি এক জামা'তের ইমাম নিযুক্ত হব, কিছু মানুষ আমার বিরোধিতা করবে আর অধিকাংশ লোক আমার সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্যদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করবেন (অর্থাৎ যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাদেরকে)। এই যে বলা হয়েছে, তোমার মান্যকারীদেরকে তোমার অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করা হবে, এটি এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, আল্লাহ্ তা'লা একদিন আমাকে নবীদের অর্থাৎ মূসায়ী ঈসা এবং মুহাম্মদী ঈসার নাম দিতে চাচ্ছেন, কেননা, খলীফার জামা'ত যত দিন খলীফা জীবিত থাকেন ততদিন বা তার জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইন্তেকালের পর কেবল নবীদের জামা'ত বা নবীর যারা প্রতিচ্ছবি তাদের জামা'তই চলতে থাকে। 'কাফারু'তেও এদিকে ইঙ্গিত আছে যে, খিলাফতের পর আরেকটি পদমর্যাদা আমার লাভ হতে যাচ্ছে, যা কতক নবীর প্রতিচ্ছবি হিসেবে লাভ হবে। 'সুবহানাল্লাহে লা ইউসআলু আম্মা ইয়াফআলু'।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৮৭-৮৯)

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, "দ্বিতীয়ত আমার একপ্রকার দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় আমি দেখেছিলাম। তা-ও এ পদের দিকে ইঙ্গিত করে। আমি দেখেছি, আমি সেই কক্ষ থেকে বের হচ্ছি, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসবাস করতেন। বাইরে উঠানে এসেছি, সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসে আছেন, তখন কোন ব্যক্তি এই কথা বলে আমাকে একটা পার্সেল দিয়ে গেছে যে, এর কিছু তোমার জন্য আর কিছু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য। কাশফে যখন আমি সেই পার্সেলে লেখা ঠিকানা দেখি, তাতে লেখা দু'টি নাম চোখে পড়ে। আর ঠিকানা এভাবে লেখা ছিল, মহিউদ্দিন এবং মঈনুদ্দিন হবেন প্রাপক।" তিনি (রা.) বলেন, "কাশফে আমার এই উপলব্ধি হয় যে, এগুলোর একটি নাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আর দ্বিতীয় নাম আমার। তখন যেহেতু আমি বালক ছিলাম, তাই হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবীর নাম আমি শুনিনি। শুধু আওরঙ্গজেব সম্পর্কে আমি জানতাম যে, তার নাম ছিল মহিউদ্দীন। তাই আমার উপলব্ধি হল যে, মহিউদ্দীন বলতে আমাকে বুঝানো হয়েছে আর হযরত

আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি এক জামা'তের ইমাম নিযুক্ত হব, কিছু মানুষ আমার বিরোধিতা করবে আর অধিকাংশ লোক আমার সমর্থনে দণ্ডায়মান হবে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্যদের বিরুদ্ধে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয় দান করবেন (অর্থাৎ যারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তাদেরকে)।

মঈনুদ্দিন চিশতী ভারতের এক প্রসিদ্ধ বুযূর্গ অতীত হয়েছেন। তাই আমি ধরে নিয়েছি, মঈনুদ্দিন বলতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বুঝায়। কিন্তু পরে আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত মহিউদ্দীন সাহেব ইবনে আরাবী অনেক বড় এক বুযূর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। আমি বুঝলাম যে, মহিউদ্দীন বলতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বুঝায়, যিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করেছেন। আর মঈনুদ্দিন হলাম আমি, যে ধর্মের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়েছে। অতএব, ধর্মকে সঞ্জীবিতকারী হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর ধর্মের সাহায্য এবং সমর্থনকারী হলাম আমি, যেভাবে বাচ্চা প্রসব করেন মা আর দাঈমা দুধ পান করায়।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০)

তৃতীয় বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, "তৃতীয় ইলহাম, যা এইভাবে আমার প্রতি হয়েছে, আর তা হয়েছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর, তা হল-"এ'মালু আলা দাউদা শুকুরা" (সূরা সাবা: ১৪) অর্থাৎ হে দাউদের বংশধর! খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চল। এই ইলহামে "এ'মালু" বলে খোদা তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ পুরোপুরি মান্য করার আদেশ দিয়েছেন আর আলে-দাউদ বা দাউদের বংশধর বলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সাথে তুলনা করেছেন। হযরত সোলায়মান (আ.) হযরত দাউদের পর খলীফা হয়েছিলেন আর একই সাথে তার পুত্রও ছিলেন।"

তিনি (রা.) বলেন, "আমার মনে পড়ে, তখন এই ইলহাম এত জোরালোভাবে আমার প্রতি নাযিল হয় যে, এই ইলহামের এবং পরিবেশের প্রভাব আমার উপর দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ছিল। আর এই ইলহাম এত স্পষ্ট ছিল যে, যদিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তখন ইন্তেকাল হয়ে যায়, যখন আমি আমার কিছু সহপাঠিদের কাছে এই কথা উল্লেখ করছিলাম, আমার মাথা থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের কথা বেরিয়ে যায় আর আমার ভিতর এই গভীর প্রেরণা হল যে, আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে এর কথা শুনাই।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৯০)

তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, "চতুর্থ সাক্ষ্য এই স্বপ্নের সত্যায়নে (মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার বিষয়ে যেই স্বপ্ন আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়েছেন) আমার এই দিব্য দর্শনের অভিজ্ঞতা। আমি দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর 'বায়তুদ্ দোয়া'-য় বসে দোয়া করছি, হঠাৎ করে আমার সামনে প্রকাশ করা হল যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইব্রাহীম ছিলেন, পুনরায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমার সামনে এটি প্রতিভাত করা হয়েছে যে, এই উম্মতে আরো অনেক ইব্রাহীম অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনিও ইব্রাহীম, তাঁর নাম আমাকে ইব্রাহীম আদম বলা হয়েছে। আদম এর এক বাদশা ছিলেন, যিনি রাজত্বকে জলাঞ্জলী দিয়ে সুফিদের জীবন আরম্ভ করেন। অতএব, আমাকে জানানো হয়েছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইব্রাহীম, পুনরায় আমাকে বলা হয়েছে তুমিও এক ইব্রাহীম।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৯০)

পঞ্চম সাক্ষ্যর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, "পঞ্চম সাক্ষ্য, যা এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সন্নিকট যুগে আমার প্রতি হয়েছে, তা হল, একবার স্বপ্নে দেখেছি যে, একটা ঘন্টা বেজেছে, পিতলের কোন পাত্রকে কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করলে যেভাবে ঢোন্-ঢোন শব্দ বের হয় এর ধ্বনি এমনই ছিল। এই ঘন্টা থেকে ঢন্-ঢন্ শব্দ উদ্ভূত হয়, কিন্তু সেই ধ্বনি এত সুমধুর যে, মনে হল সারা পৃথিবীর মিউজিকের সুমধুর ধ্বনি তাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ধ্বনি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পুরো বায়ু মণ্ডলে ছড়িয়ে গিয়ে একটা ফ্রেমের রূপ নেয়, (যা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পরে আর একটা ফ্রেমে রূপ নেয়) যেভাবে ছবি ফ্রেমবদ্ধ থাকে। এরপর আমি দেখেছি, সেই ফ্রেমে একটা ছবি আত্মপ্রকাশ করে, যা কোন সুদর্শন এবং সুন্দর ব্যক্তিত্বের। এরপর সেই ছবিতে একপ্রকার গতি সঞ্চার হয় এবং স্বল্পক্ষণ পর নিমিষেই তা থেকে বেরিয়ে এক সত্তা আমার সামনে আবির্ভূত হন, যার সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হয় যে, সে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা। আমাকে সম্বোধন করে সে বলে যে, আস, আমি তোমাকে সূরা ফাতেহার দরস দিচ্ছি।

সুতরাং ফেরেশতা আমাকে সূরা ফাতেহার দরস দেয়া আরম্ভ করে এবং ক্রমাগতভাবে দেয়া অব্যাহত রাখে আর 'ইয়া কা'নাবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন'-এর তফসীর আরম্ভ করতে গিয়ে বলে যে, আজ পর্যন্ত যত মুফাস্‌সের অতিবাহিত হয়েছে, তারা সবাই 'মালিকি ইয়াউমিদ্দিন' পর্যন্ত তফসীর শিখেছে কিন্তু আমি তোমাকে এর পরের তফসীরও শিখাচ্ছি। পুরো সূরা ফাতেহার তফসীর সে আমাকে পড়িয়েছে। আমার চোখ খোলার পর স্বপ্নে সেই ফেরেশতা যে সব কথা আমাকে বলেছিল সেগুলোর কিছু আমার মনে ছিল কিন্তু তা আমি নোট করি

নি আর পরে আমি তা ভুলে যাই। সকালে এই স্বপ্নের কথা যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে শুনাই আর একই সাথে বলি যে, স্বপ্নে ফেরেশতা আমাকে যেসব কথা বলেছিল, তার কতক চোখ খোলার পর আমার মনে ছিল কিন্তু সকালে জাগ্রত হওয়ার পর সেই সব কথা আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে যায়। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি এত গভীর জ্ঞানকে হেলায় নষ্ট করেছ। এগুলোকে নোট করা উচিত ছিল।"

তিনি (রা.) বলেন, সেই দিনের পর আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতেহা থেকে সব সময় আমাকে নিত্যনতুন নিগূঢ় রহস্যের কথা বুঝান। এখনও এই স্বপ্ন দেখার পর আমি যখন ভাবলাম যে, জামা'তের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্য স্পষ্ট কী পরিকল্পনা হাতে নেয়া যেতে পারে, তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সূরা ফাতেহা থেকেই অতি স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বুঝিয়েছেন যা অনুশীলন করে ইসলামের এমন উন্নতি হতে পারে যে, শত্রু তা দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকবে না। এই পরিকল্পনা অনুসারে সেসব ভুল-ভ্রান্তিরও আল্লাহ্ তা'লার ফজলে নিরসন সম্ভব যা রসূল করীম (সা.)-এর তিরোধানের পর মুসলমানরা ইসলামী ব্যবস্থাপনা এবং ইসলামী সামাজিক শিক্ষামালাকে বুঝতে ভুল করেছে (অর্থাৎ পরবর্তী যুগের মুসলমানদের যে ভ্রান্তি ঘটেছিল)। এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। এই স্বপ্নের আসল ব্যাখ্যা এটিই ছিল, যা আমার অভ্যন্তরীণ বৃত্তিতে বিশেষ করে সূরা ফাতেহার জ্ঞান এবং মোটের উপর কুরআনের জ্ঞান অন্তর্নিহিত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে অন্তর্নিহিত ইলহামের মাধ্যমে যা প্রকাশ করা হবে।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৫তম খণ্ড, পৃ. ৯০-৯২)

তিনি (রা.) আরো বলেন, জামা'তে যখন মতভেদ দেখা দেয়, আল্লাহ্ তা'লা তখন ইলহামযোগে আমাকে জানিয়েছেন যে, 'লানুমাজ্জিকান্নাহুম' অর্থাৎ আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে দিব। তখন এরা (জামা'ত ছেড়ে গিয়েছিল), তারা বলত, আমরা শতকরা পচানব্বইভাগ জামা'ত কিন্তু এখন তাদের অবস্থা কি হয়েছে? আল্লাহ্ তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাদেরকে সত্যিকার অর্থে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। খাজা কামালুদ্দিন সাহেব তার ইন্তেকালের পূর্বে লিখেছেন, "মির্যা মাহমুদ আমাদের সম্পর্কে যে ইলহাম ছেপেছিল, তা শতভাগ পূর্ণতা লাভ করেছে, আমরা সত্যিই টুকরো টুকরো হয়ে গেছি।"

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, "মূল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লা বার বার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন যে, মুসলেহ মওউদ আল্লাহ্ তা'লার সত্যের আত্মায় সম্মানিত হবেন। এগুলো খোদার নিদর্শনাবলী যা তিনি আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।" ভবিষ্যদ্বাণীর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

যাহোক, আগামী দিনগুলোতে জামা'তে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে জলসা হবে, এম.টি.এ-তেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হচ্ছে। জামা'তের সদস্যদের তাতে বেশি বেশি যোগদান করা উচিত, শোনা উচিত, যেন ভবিষ্যদ্বাণীর গভীর জ্ঞান তাদের লাভ হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বহু নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে, পঞ্চাশটি, পঞ্চান্ন বরং ষাটটি হবে, তিনি অর্থাৎ, মুসলেহ্ মওউদ এগুলো বের করেছেন। তিনি (রা.) মুসলেহ্ মওউদের যে বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর যে লক্ষণাবলী ছিল তা বড় মহিমার সাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০-১৬ মার্চ ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ১০, পৃ. ৫-৭)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জুমুআর খুতবা

ইসলামের সেবায় আহ্‌মদীদের আর্থিক কুরবানী ও ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৬ জানুয়ারি, ২০১৭ মোতাবেক ৬ সুলাহ্ ১৩৯৬ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর কোন কোন সময় সে সদকা খয়রাতও করে আর জন-হিতকর কাজও করে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন কোন জামা'ত নেই, এমন কোন দল নেই, যার সদস্যভুক্ত ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে একই লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে আর সেই লক্ষ্য হল, ধর্ম প্রচার এবং সৃষ্টির সেবা করা। হ্যাঁ, আজকে ধরা পৃষ্ঠে কেবলমাত্র একটিই জামা'ত রয়েছে, যারা এই কাজ করে চলছে। আর এটি সেই জামা'ত, যাকে আল্লাহ্ তা'লা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি সেই জামা'ত. যা রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদীত প্রাণ দাসের জামা'ত, এটি সেই জামা'ত' যা প্রতিশ্রুত মাসীহ্ এবং মাহদীর জামা'ত, যার উপর সারা বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। এই জামা'ত গত প্রায় ১২৮ বছর ধরে ইসলাম এবং মানবতার সেবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে চলেছে। আর এর কারণ হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জামা'তকে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ধন-সম্পদের সঠিক ব্যয়-স্থল এবং ধন-সম্পদ কুরবানীর প্রকৃত ব্যুৎপত্তি দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "আমি

পৃথিবীতে মানুষ ধন-সম্পদ ব্যয় করে ব্যক্তিগত সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আর কোন কোন সময় সে সদকা খয়রাতও করে আর জন-হিতকর কাজও করে। কিন্তু পৃথিবীতে আজ এমন কোন জামা'ত নেই, এমন কোন দল নেই, যার সদস্যভুক্ত ব্যক্তিরা পৃথিবীর সকল শহর ও সকল দেশে একই লক্ষ্যে, এক নেতৃত্বের অধীনে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করছে আর সেই লক্ষ্য হল, ধর্ম প্রচার এবং সৃষ্টির সেবা করা।

বারবার জোর দেই যে, খোদা তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় কর। এটি খোদা তা'লার নির্দেশে, (খোদার নির্দেশে আমি এই নির্দেশ দিচ্ছি।) কেননা, ইসলাম এখন ক্রমশঃ অধঃপতনের শিকার। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দেখে আমি ব্যাকুল হয়ে যাই। আর ইসলাম বিভিন্ন বিরোধী-ধর্মের শিকারে পরিনত হচ্ছে।" তিনি (আ.) বলেন, "পরিস্থিতি যেখানে এমন, সেখানে ইসলামের উন্নতির জন্য কি আমরা কোন পদক্ষেপ নেব না? এ উদ্দেশ্যেই খোদা তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব, এর উন্নতির জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলিয়ে যাওয়াই খোদার নির্দেশ এবং খোদার ইচ্ছার অনুগমন করা।"

অতঃপর, তিনি (আ.) আরো বলেন, "এ সব প্রতিশ্রুতি খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই যে, যে ব্যক্তি খোদার পথে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করবে, আমি তা বহুগুণ বর্ধিত করব, পৃথিবীতেই সে অনেক কিছু পাবে। আর মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও সে দেখবে যে, কত অসাধারণ সুখ ও আরাম সে লাভ করছে! এক কথায়, আমি এ বিষয়ের দিকে তোমাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।" তিনি বলেন, "আমি এখন এ বিষয়ের দিকে তোমাদের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতির জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় কর।" (মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪)

অতএব, তাঁর সাহাবীরা (রা.) এ সব কথা বুঝতে পেরেছেন আর নিজেদের সম্পদ তাঁরা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছেন, যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে করেছেন যে, কিভাবে তাঁর মান্যকারীরা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অসাধারণভাবে অগ্রগামী ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন মিনারাতুল মসীহ্‌র নির্মাণের তাহরীক করা হয়, তখন তাঁর আরো বেশ কিছু তাহরীকও ছিল। বই-পুস্তক ছাপাসহ অন্যান্য আরো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্যও তিনি (আ.) তখন তাহরীক করতেন। একইভাবে, মিনারাতুল মসীহ্‌র জন্য যখন তিনি তাহরীক করেন, তখন মুন্সি আব্দুল আযীয সাহেব পাটওয়ারী যে আর্থিক কুরবানী করেছেন, তার উল্লেখ করতে গিয়ে বরং দু'জনের কথা তিনি বলেছেন, আব্দুল আযীয সাহেব এবং সাদী খান সাহেব। তিনি (আ.) বলেন, "আমার জামা'তের দু'জন এমন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এ লক্ষ্যে চাঁদা দিয়েছেন, যা অন্যদের জন্য সত্যিই ঈর্ষনীয় ব্যাপার। তাদের একজন হলেন, মুন্সি আব্দুল আযীয সাহেব, গুরুদাস পুর জেলায় তিনি পাটওয়ারী হিসেবে কাজ করেন। অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি এ কাজের উদ্দেশ্যে ১০০ রুপী চাঁদা প্রদান করেন। আর আমি মনে করি, এই ১০০ রুপী তার বেশ কয়েক বছরের সঞ্চয় হবে।" তিনি বলেন, "তিনি এ জন্যেও সমধিক প্রশংসার যোগ্য, কেননা অন্য একটি কাজেও সম্প্রতি তিনি ১০০ রুপী প্রদান করেছেন।" তিনি (আ.) আরো বলেন, "দ্বিতীয় নিষ্ঠাবান, যিনি এখন অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, তিনি হলেন শিয়ালকোট নিবাসী, মিয়া সাদী খান সাহেব, যার লাকড়ীর ব্যবসা রয়েছে। অন্য একটি কাজেও তিনি সম্প্রতি ১৫০ রুপী চাঁদা দিয়েছেন। আর এখন এ কাজের জন্য ২০০ রুপী চাঁদা পাঠিয়েছেন। আর তিনি খোদার উপর অসাধারণ ভাবে ভরসাকারী। তিনি সেই ব্যক্তি, যার ঘরের পুরো আসবাবপত্র, ইত্যাদি একত্র করে দেখলে এর মোট মূল্য ৫০ রুপীর বেশি হয়তো হবে না।" তিনি বলেন, "তিনি লিখেন, যেহেতু এটি দূর্ভিক্ষের সময় আর জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে স্পষ্টতই লোকসান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাই আমাদের জন্য ধর্মীয়-ব্যবসা করাই শ্রেয় মনে হয়। কাজেই, আমাদের কাছে যা কিছু ছিল সব পাঠিয়ে দিচ্ছি।"(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৪-৩১৫)

এভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো অনেকের দৃষ্টান্ত তাঁর বই-এ আর মলফুযাতে বর্ণনা করেছেন, যারা নিজেদের প্রয়োজনের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানী করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের মাঝে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণা আর উদ্দীপনা এত অসাধারণভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রজন্ম পরম্পরায় এমনটি করে চলেছে। বরং পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, পরে এসে যারা জামা'তে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে, তারাও এ সব পুন্যবানদের আর্থিক কুরবানীর কথা যখন শুনেন আর যখন এটি শুনেন যে, অমুক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর্থিক কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে এবং খোদার বাণী শুনে এর প্রকৃত মর্ম যখন বুঝে, তখন তারা এমন এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়। **সম্পদশালীদের চেয়ে মধ্য-বিত্তরা, বরং দরিদ্ররা বেশি কুরবানী উপস্থাপন করে আর আশ্চর্যজনক কুরবানীর দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে। তাদের এই চিন্তা আসে না যে, আমাদের তুচ্ছ আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে কী-বা লাভ হবে? বরং তারা খোদার এ বাণীকে বুঝেন, যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,**

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

(সূরা বাকারা: ২৬৬)

অর্থাৎ, **"আর যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায়, যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয়, তাহলে শিশিরই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ্‌ এর সম্মক-দ্রষ্টা।"**

অতএব, এ সব দরিদ্রদের কুরবানী 'তাল' অর্থাৎ কুয়াশার ন্যায়। এই সামান্য আর্দ্রতা, যা তাদের নিছক কুরবানীর ফলে ধর্মের বাগানে লাভ হয়, তা আল্লাহ্‌ তা'লার ফযলে অগণিত, অসাধারণ ফল বহন করে। আমরা দেখি যে, এক দরিদ্র জামা'ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানব সেবামূলক কাজ আমরা করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্‌ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ এবং বরকত রেখে দেন যে, পৃথিবীর মানুষ এই ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, এত সীমিত উৎসের বা সাধ্যের মধ্যেও তোমরা এত কাজ কিভাবে সাধন করতে পার? এটি সম্ভব হওয়ার কারণ হল, এ সমস্ত ত্যাগী ব্যক্তিরা ঐ সব লোকের মধ্যে গণ্য হওয়ার চেষ্টা করেন, যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌ তা'লা এভাবে দিচ্ছেন যে, 'ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ইবতিগাআ মারযাতিল্লাহ' অর্থাৎ, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে ব্যয় করে। আর খোদার সন্তুষ্টিই যদি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ফলও লাভ হয় অনেক আর কল্যাণও অনেক বেশিই বয়ে আনে। যেভাবে আমি বলেছি, আজও কুরবানীর এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, বরং বহু দৃষ্টান্ত আছে। এর কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি-

কাদিয়ান থেকে সহস্র সহস্র মাইল দূরে বসবাসকারী এক মেয়ে যখন আহমদীয়াত তথা সত্য ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়, তখন তার চিন্তাধারায় কিভাবে পরিবর্তন আসে! আর কুরবানী এবং ত্যাগের কী ব্যুৎপত্তি তার অর্জিত হয়! এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা সেই মেয়ের ভাষায় শুনুন। এই মেয়ে ইউগান্ডায় বসবাস করে, সে অশিক্ষিত নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে বলে, গত জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কিছু জিনিস ক্রয় করার ছিল, কিন্তু অর্থ ছিল অপর্যাপ্ত আর চাঁদাও বাকি ছিল। আমি সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্‌ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি আমার চাঁদা দিয়ে দিয়েছি। এক মাস পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে তখনও তিন দিন বাকি ছিল। আমার এক আন্টি আমার মাকে ফোন করেন যে, আমি কবে ইউনিভারসিটি যাচ্ছি। তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। সন্ধ্যাবেলা যখন আমি তার বাড়িতে যাই, তিনি আমাকে কিছু অর্থ দেন, তা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের যা প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আর চাঁদা হিসেবে যা দিয়েছিলাম এ অর্থ তার দশগুণ বেশি। এভাবে খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এমন স্থান থেকে আমাকে সাহায্য করেছেন, যে স্থান থেকে অর্থ আসার কোন আশাই ছিল না।

ভারতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে সেখানকার ইন্সপেক্টর কমর উদ্দীন সাহেব লিখেন, কেরালার মুঞ্জেরী জামা'তের এক সদস্য, তার রেক্সিনের (Rexine) ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার দোকানে যাই। এতে তিনি বলতে থাকেন, তার অনেক পাওনা টাকা মানুষের কাছে রয়েছে আর এ কারণে তিনি অনেক সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক বড় অঙ্কের চেক প্রদান করতে গিয়ে বলেন যে, এখন একাউন্টে এত টাকা নেই, কিন্তু দোয়া করবেন আমি যেন অচিরেই এই অর্থ আদায় করতে পারি। তিনি বলেন, পরের দিনই ফোন আসে যে, আল্লাহ্‌র ফযলে চেক দেয়ার পরক্ষণেই আমার একাউন্টে অনেক বড় অঙ্ক এসে গেছে, তাই চেক ক্যাশ করিয়ে নিন। তিনি বলতে থাকেন যে, এটি কেবলই চাঁদার কল্যাণে সম্ভব হয়েছে, এত স্বল্পতম সময়ে আল্লাহ্‌ তা'লা ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ব আফ্রিকার তানজানিয়ায় বসবাসকারী এক বিধবার দৃষ্টান্ত: এ সম্পর্কে তানজানিয়ার আমীর সাহেব লিখছেন যে, আড়েঙ্গা টাউনের মুয়াল্লেম সাহেব এক বিধবা মহিলা আমিনার কাছে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহের জন্য যান। তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, এখন আমার কাছে কিছুই নেই, ব্যবস্থা হতেই আমি অর্থ নিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হব। মুয়াল্লেম সাহেব তখনো বাড়ি পৌঁছেন নি, এর পূর্বেই সেই ভদ্র মহিলা দশ হাজার শিলিং নিয়ে উপস্থিত হন এবং বলেন, এ অর্থ কোন এক স্থান থেকে এসেছে, তাই ভাবলাম, আপনাকে দিয়ে আসি। প্রথমে চাঁদা দেই, নিজের অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা পরে হবে। তিনি বলেন, আমরা ওয়াদা ছিল পঁচিশ হাজারের, বাকি পনের হাজার আসতেই আমি নিয়ে আসব। তিনি দশ মিনিট পর পুনরায় অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন আর বলেন যে, আল্লাহ্‌র ব্যবহার দেখুন, আল্লাহ্‌র পথে আমি যে দশ হাজার দিয়ে গেলাম, বাড়ি পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঠিয়ে দিয়েছেন, যা থেকে পনের হাজার চাঁদা প্রদানের পরও আমার কাছে বিশ হাজার অবশিষ্ট থাকে আর এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'লার কৃপা এবং চাঁদারই কল্যাণ। আর এভাবে তার ঈমানও দৃঢ় হয়েছে।

সেন্ট্রাল আফ্রিকার একটি দেশের নাম হল কঙ্গো। সেখানকার লোকদের মাঝে কিভাবে কুরবানীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। মুবাল্লেগ রমিজ সাহেব লিখছেন, কালোমবাই (Kalombaui) জামা'তের এক দাঈ-ইলাল্লাহ্‌ সাঈদী সাহেব পার্শ্ববর্তী পাঁচটি জামা'তে সফর করেন এবং তবলীগ করেন। বর্তমানে সে দেশের অবস্থা ভালো নয়। নিরাপত্তার অভাব সত্ত্বেও নিজ হালকার সব জামা'ত তিনি সফর করেন। আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়া সত্ত্বেও পূণ্যের খাতিরে, সফরের ব্যয়ভারও নিজেই বহন করেন। এই সফরে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসেবে তিনি তিপ্পান্ন হাজার স্থানীয় মুদ্রা সংগ্রহ করে জমা করান আর বলেন, আমি এক পুরোনো আহমদী, যুবকদের জন্য আমার আদর্শ হওয়া চাই।

এক দরিদ্র জামা'ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সর্বত্র ইসলাম প্রচার এবং মানব সেবামূলক কাজ আমরা করে যাচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাজে আল্লাহ্ তা'লা এত অসাধারণ কল্যাণ এবং বরকত রেখে দেন যে, পৃথিবীর মানুষ এই ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয় যে, এত সীমিত উৎসের বা সাধ্যের মধ্যেও তোমরা এত কাজ কিভাবে সাধন করতে পার?

সেখানকার পুরোনো আহমদী বলতে কত পুরোনো হবে? খুব বেশি হলে পনের-বিশ বছর হবে। তার বয়স ৬০বছরের উপরে, কিন্তু অসাধারণ পরিশ্রম করে তবলীগের কাজ করছেন আর এর পাশাপাশি চাঁদার প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। এই হল সেই প্রেরণা ও চেতনা, যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ) কে গ্রহণের পর এদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এরা পৃথিবীর দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করেন। এমন অঞ্চলে বসবাস করেন, যেখানে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধাও নেই, এমনকি রাস্তাঘাটও নেই। পানি বহুল অঞ্চল, নৌকাতেই সফর করা হয়। আর দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে যেতে হয়।

পশ্চিম আফ্রিকার বেনিনের এক আহমদীর দৃষ্টান্ত দেখুন। আহমদীয়াত গ্রহণের বয়স যার এখনো এক বছর পূর্ণ হয় নি, কিন্তু দেখুন, কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা কত উন্নতমানের। পুরোনো আহমদীদের জন্য এটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। সেখানকার মুবাল্লেগ মুজাফ্ফর সাহেব লিখেন, কুতুনী অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল, ডিকাম্বে (Dekambe)। সেখানে এ বছর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত মাছ ধরে বিক্রি করে। তারা জেলে আর তাদের জীবন জীবিকা এভাবেই নির্বাহ হয়। স্থানীয় মুবাল্লেগ গ্রামবাসীদের চাঁদার তাহরীক করলে এক আহমদী বন্ধু, যিনি আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিয়ে এক হাজার ফ্রাঙ্ক কুরবানী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমার অবস্থা যদিও ততটা স্বচ্ছল নয়, কিন্তু আমি চাই না যে, যে জামা'তে যোগ দিয়েছি, সে জামা'তের পক্ষ থেকে কোন তাহরীক হবে আর আমি তাতে অংশ নেয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাব।

খেলাফতের সাথে সম্পর্ক এবং খুতবার প্রভাব কিভাবে মানুষের উপর পরে তা দেখুন! আর কুরবানীর প্রতি কিভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয় তাও দেখুন। পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাঁসুর কয়েকজন যুবকের ঘটনা এটি। তাদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তত পুরোনো নয়, কিন্তু তাদের মান কোন পর্যায়ের দেখুন! সেখানকার মুরব্বী আমীন ব্লুচ সাহেব লিখেন- ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ সনের খুতবা গত বছরের শেষ খুতবা ছিল। আর নববর্ষের সূচনার বরাতে আমি যে খুতবা দিয়েছিলাম তা শুনে সেখানকার অর্থাৎ, বানফুরা অঞ্চলের কয়েকজন যুবক, যারা নতুন আহমদী আর কিছু পুরোনো আহমদীও খুতবা শোনার তাৎক্ষণিক পর বাড়ি যান এবং নববর্ষ বরণের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন, তা নিয়ে আসেন আর ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দেন আর বলেন যে, যুগ খলীফা যেহেতু আমাদেরকে বর্ষ বরণ ও উদযাপনের রীতি শিখিয়েছেন, তাই এই অর্থ আমরা চাঁদা হিসেবে দিচ্ছি এবং রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের মাধ্যমে আমরা বর্ষবরণ করব। আর এভাবে সে দিন তারা প্রায় ৭৬,০০০ ফ্রাঙ্ক সীফা চাঁদা হিসেবে দিয়েছেন।

পশ্চিম আফ্রিকারই আরেকটি দেশ আইভরিকোস্টের ছোট একটি গ্রামের লোকদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত দেখুন! বুওয়াকী অঞ্চলের মুয়াল্লেম মামাদু সাহেব লিখেন, আমাদের অঞ্চলের একটি গ্রামের নাম হল, নিয়াভোগো (Niavogo)। এ গ্রামের মানুষ এই বছরই আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভূক্ত হয়। সবেমাত্র এক বছর হয়েছে। তিনি বলেন, আমি নতুন বয়আতকারীদের ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণ এবং জলসা সালানায় যোগদানের তাহরীক করি। সেই নতুন বয়আতকারীদেরকে বলি, যুগ খলীফা বলেছেন যে, সব আহমদীরা যেন ওয়াকফে জাদীদ এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশ গ্রহণ করে। তিনি বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, হয়তো গুটিকতক মানুষ সামান্য পয়সা এ খাতে চাঁদা দিবে। কেননা, তারা চরম দারিদ্রের মাঝে জীবন অতিবাহিত করে কিন্তু পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে। আর এক বন্ধু শুধু চাঁদাই দেন নি, বরং ৬০০ কিলোমিটার সফর করে আবিজানের জলসা সালানায় যোগদান করেন।

কুরবানীর আরেকটি দৃষ্টান্ত আর খোদার ব্যবহার দেখুন! তানজানিয়া থেকে মুবাল্লিগ ইউসুফ উসমান সাহেব লিখেন, এক আহমদী ভাই, যার চলার শক্তি নেই, পঙ্গুত্বের কারণে কাজ করতে পারেন না, তানজানিয়ার সকল অঞ্চলে এখনো বিদ্যুত যায় নি। তাই কিছু কিছু মানুষ ছোট ছোট সোলার প্যানেল নিয়ে ঘরে দু'একটি বাল্ব জালানোর ব্যবস্থা করেন। আমাদের এই আহমদী ভাইও ছোট সোলার প্যানেল দিয়ে মানুষের মোবাইল চার্জ করে দেন আর এভাবে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। সামান্য যে আয় হয়, সেই আয় অনুসারে রীতিমত চাঁদাও দেন। একদিন আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব চাঁদার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, গত দু'দিনে দুই হাজার শিলিং আমার আয় হয়েছে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে এটিই প্রদান করছি। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, যদি পুরো অর্থই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন, তাহলে ঘরে স্ত্রী-বাচ্চাদের জীবিকা কিভাবে নির্বাহ হবে? তিনি বলেন, খোদা তা'লা নিজেই জীবিকার বিধান করে থাকেন, তিনিই কোন ব্যবস্থা করবেন। মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, আমি রশীদ কাটতেই অনেকেই তার কাছে মোবাইল চার্জ করার জন্য আসে এবং যতটা তিনি চাঁদা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি আয়

হয়। তখন সেই ব্যক্তি মুবাল্লিগ সাহেবকে বলেন, আপনি দেখেছেন, খোদার পথে চাঁদা দেয়ার বরকত এবং কল্যাণ কত! এখনই যা দিয়েছি, তার চেয়ে বেশি অর্থ তিনি আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এরপর আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে কুরবানীকারীদেরকে আল্লাহ কিভাবে কল্যাণমণ্ডিত করেন এবং তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন, তার এক দৃষ্টান্ত দেখুন! তানজানিয়ার সিয়ানিগা অঞ্চলের এক জামা'তের এক বন্ধুর পুত্র ভয়াবহ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার জন্য তার কাছে কেবল ১,৫০০ শিলিং ছিল। সেক্রেটারী মাল তার বাড়ি গিয়ে চাঁদার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই অর্থ পকেট থেকে বের করে চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। এরপর সেই বন্ধু বলেন, প্রথমে আমার এই চিন্তা হল যে, ছেলের চিকিৎসার অর্থ কোথা থেকে আসবে? কিন্তু পরক্ষণেই আমি ভাবলাম, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছি, আল্লাহ্ তা'লাই ব্যবস্থা করবেন। স্বল্পক্ষণ পর অন্য শহর থেকে তার বড় পুত্র ফোন করে বলেন, আমি ৮০,০০০ শিলিং পাঠাচ্ছি আর এই অর্থ সেই দিনই তার হস্তগত হয়। ছেলের চিকিৎসা খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণেরও ব্যবস্থা হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার চেয়ে বেশ কয়েক গুণ বেশি দান করেছেন। এখন তিনি এই ঘটনা অন্যদেরকেও শোনান এবং স্থানীয় লোকদের সামনে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করেন।

পশ্চিম আফ্রিকার আরেক দেশ মালী, এখানকার এক ব্যক্তির আর্থিক কুরবানীর ঘটনা শুনুন। মুবাল্লিগ আহমদ বেলাল সাহেব লিখছেন, সাকাসু অঞ্চলের এক বন্ধু ২০১৩ সনে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের সময় মারাত্মক আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন, ঋণগ্রস্থ থাকা ছাড়াও বেশ কয়েক প্রকার পারিবারিক সমস্যা ছিল। তার অবসর গ্রহণের দিনও ঘনিয়ে এসেছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি যখন চাঁদার বরকতের কথা জানতে পারেন, তখন তিনি নিজের সাথে অঙ্গীকার করেন, রীতিমত চাঁদা দিবেন আর এমনটিই তিনি করেন। আর প্রতিকূল পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও সাধ্য অনুসারে চাঁদা দিতে থাকেন। তিনি বলেন, চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে স্বল্পতম সময়ে আমার সব ঋণ পরিশোধ হয়ে যায় আর পারিবারিক দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে পদোন্নতি দেয়া হয়। আমার অবসরও বিলম্বিত করা হয়। এখন তিনি ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনাতেও অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।

সিয়েরালিওন থেকে মুবাল্লিগ মুনীর হোসেন সাহেব লিখেন, বুওয়াজেবু (Boajibu) জামা'তের এক আহমদী ভদ্রমহিলা চার হাজার লিওন ওয়াদা করেছেন আর তার আয়ের তেমন কোন উৎস ছিল না। কেবল ছোট একটি বাগান ছিল, যেখানে তিনি কাসাভা চাষ করে রেখেছিলেন। কাসাভা এক প্রকার কন্দ, মিষ্টি আলুর ন্যায় লম্বা হয়, যা খাওয়া হয়। সেটা বিক্রি করেই তার দিনাতিপাত হয়। চাঁদা দেয়ার সময় যখন ঘনিয়ে আসে আর সেক্রেটারী সাহেব চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার কাছে যান, তখন চাঁদার জন্য যে অর্থ তিনি একত্রিত করেছিলেন, তার কোন ছেলে তা নিয়ে যায় এবং খরচ করে ফেলে। এতে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখুন! তার এক পুত্র মদের দোকানে কাজ করতো, সীমাবদ্ধতা ছিল বা পুরোপুরি ঈমান আনে নি, সে বলে যে, আমি ঋণ হিসেবে এই অঙ্ক আপনাকে দিচ্ছি। সেই মা পরিষ্কারভাবে তা নিতে অস্বীকার করেন আর বলেন, এই পয়সা হালাল নয়। তাই এই পয়সা আমি চাঁদা হিসেবে দিতে পারি না। এই হল ঈমানের জন্য আত্মাভিমান। কিন্তু প্রত্যুত্তরে খোদার ব্যবহার দেখুন! খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানই হল বান্দার উদ্দেশ্য আর আল্লাহ্ তা'লা কী ব্যবহার করেছেন! তিনি বলেন, ইত্যবসরে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আসে, যাকে তিনি আদৌ চিনতেন না। সেই ব্যক্তি তাকে ১০,০০০ লিওন দেন। ৪,০০০ লিওন চাঁদা দেয়ার পরিবর্তে ১০,০০০ লিওন তিনি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর বলেন, চাঁদা প্রদানের জন্যই আল্লাহ্ তা'লা এই অঙ্ক আমাকে পাঠিয়েছেন। পরের বছরের জন্যও তিনি ১০,০০০ লিওন ওয়াদা লিখান।

সিয়েরালিওন থেকেই মুবাল্লিগ আকীল সাহেব বলেন, বুঁ অঞ্চলের এক নতুন বয়আতকারী বন্ধুর দীর্ঘদিন থেকে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলে আসছিল আর বিবাদি পক্ষ ছিল খুবই প্রভাবশালী। বাহ্যত তার মামলা করার মত কোন পরিস্থিতি ছিল না। সেই সময় মসজিদে তিনি আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ সম্পর্কে শুনেন। তিনি বলেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণের কথা যখন শুনলাম, ভাবলাম আমিও চাঁদা দেই। নতুন বয়আতকারী, খ্রিষ্ট ধর্ম ছেড়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, হতে পারে এই চাঁদার কল্যাণে আমার জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই সাধ্য অনুসারে চাঁদা দেন। এর স্বল্পকাল পরেই মামলার রায় তার পক্ষে যায়, যা বাহ্যত অসম্ভব ছিল। এই বন্ধু বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ সবকিছুই আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে হয়েছে।

কঙ্গো কিনসাশার মুবাল্লিগ শাহেদ সাহেব লিখেন, এক ভদ্রমহিলা, যার ক্ষুদ্র ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশীয় পরিস্থিতির কারণে বছরের প্রারম্ভেই মনে হচ্ছিল যে, ব্যবসায় লাভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বছরের প্রারম্ভেই আমি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়ে দেই। আর চিন্তা করি যে, খোদার সাথে কৃত ব্যবসায় কখনো ক্ষতিকর হতে পারে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার ব্যবসায় লাভ হয়। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার কোন লোকসান হয় নি।

আহমদীদের কুরবানীর কি প্রভাব অন্যদের উপর পড়ে তা দেখুন! আর এর ফলে তবলীগের পথও সুগম হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের আমীর সাহেব লিখেন- তিন বন্ধু, যারা জেরে তবলীগ, তাদেরকে অনেক তবলীগ করা সত্ত্বেও বয়আতের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। গত জুমুআয় এই তিন বন্ধু মসজিদে আসেন, জুমুআর খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের বরাতে মনোযোগ আকর্ষণ করা হলে জুমুআর পর মানুষ চাঁদা দেয়ার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। জেরে তবলীগ এই তিন বন্ধু এই দৃশ্য দেখে বলেন, চাঁদা নেয়ার জন্য বক্তৃতা করতে করতে আমাদের মৌলভীদের গলা ও মুখ উভয়ই শুকিয়ে যায়, তবুও মানুষ চাঁদা দেয় না। এখানে সামান্য একটি ঘোষণার পর চাঁদা দেয়ার জন্য মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এটিই প্রকৃত ইসলামিক প্রেরণা এবং শিক্ষা। এই দৃশ্য দেখে এই

তিন বন্ধু তখনই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। আর ওয়াকফে জাদীদ খাতে তারা চাঁদাও প্রদান করেন।

বেনিনের একটি অঞ্চলের মুয়াল্লিম আব্দুল্লাহ্ সাহেব পুনরায় লিখেন, নতুন বয়আতকারী একটি জামা'ত "কাপাকপাজা"য় (Kpakpaza) চাঁদা সংগ্রহের জন্য সফর করি। একজন নতুন বয়আতকারী আহমদী আলহাজ আবু বকর সাহেব বলেন, এই চাঁদা কোথায় বা কিভাবে ব্যবহার করা হয়? আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুরো জ্ঞান তার ছিল না। তাকে তখন বলা হয় যে, জামা'তে আহমদীয়া এসব চাঁদার মাধ্যমে মসজিদ নির্মাণ করে, কুরআনের অনুবাদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তক প্রচার করে। এসব চাঁদার মাধ্যমে হাসপাতাল, স্কুল এবং এতিমখানা নির্মাণ করা হয়। চাঁদা হিসেবে প্রদত্ত এক একটি পয়সা শত ভাগ ধর্মীয় এবং মানব কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এটি শোনার পর আবু বকর সাহেব বলেন, মৌলভীরা আমার কাছে যাকাত এবং খয়রাত নেয়ার জন্য আসতো। কিন্তু কখনো তারা বলে নি যে, সেই টাকা কোথায় ব্যবহার করা হয়। তিনি তখনই চাঁদা আদায় করেন এবং বলেন, ভবিষ্যতে জামা'তের সকল খাতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আমি অংশ নিব।

আমরা যদি দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখি, এই যুগেও আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তকে এমন মানুষ দিচ্ছেন, কুরবানীর ক্ষেত্রে যারা থাকে অগ্রগামী। তারা নতুন আহমদী। আহমদীয়াত গ্রহণের স্বল্প সময়ের ভিতরই আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারের এক গভীর প্রেরণা তাদের মাঝে দেখা যায়। আর তাদের জন্য এটি চিন্তার বিষয়, যারা স্বচ্ছল, যারা সঙ্গতিশীল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আর্থিক সাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন, তারা সম্পদশালী দেশে বসবাস করে, কিন্তু তাদের কুরবানী একেবারেই তুচ্ছ হয়ে থাকে। যদিও এখানেও অনেকেই এমন আছে, যারা অসাধারণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। কিন্তু এমন অনেক সম্পদশালী বা ধনী মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে, যাদের এদিকে দৃষ্টি খুবই কম। এদিকে তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে যেভাবে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করার রীতি রয়েছে, সে রীতি অনুযায়ী বহু ঘটনার মধ্য থেকে মাত্র এ কয়েকটি ঘটনাই আপনাদেরকে শুনানোর জন্য আমি বেছে নিয়েছি। চাঁদার গুরুত্ব তুলে ধরার পর এখন আমি ওয়াকফে জাদীদের ৬০তম বছরের ঘোষণা দিচ্ছি। আর গত বছর খোদার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে, তাও উল্লেখ করছি যে, আদায় কেমন ছিল।

ওয়াকফে জাদীদের বছরের সমাপ্তি ঘটে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে। ৫৯তম বছরের সমাপ্তি ঘটেছে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে। খোদার অপার কৃপায় পৃথিবীর জামা'তগুলো থেকে এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে, তাতে ওয়াকফে জাদীদ খাতে জামা'ত ৮০,২০,০০০ পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। গত বছরের চেয়ে এ বছর জামা'ত ১১,২৯,০০০ পাউন্ড বেশি চাঁদা দিয়েছে। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে এ বছরও পাকিস্তান পৃথিবীর জামা'তগুলোর মাঝে মোটের উপর তালিকার শীর্ষে রয়েছে।

স্থানীয় মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গত বছরের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে যারা চাঁদা বৃদ্ধি করেছে, তাদের মধ্যে আফ্রিকার দেশ ঘানা তালিকার শীর্ষে। এরপর জার্মানি, পাকিস্তান এবং তারপর রয়েছে কানাডা।

আফ্রিকান দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কুরবানী যারা করেছে, তাদের মাঝে রয়েছে মালি, বুরকিনা ফাঁসো, লাইবেরিয়া, সাউথ আফ্রিকা, সিয়েরালিওন এবং বেনিন।

সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের বাইরে বহির্বিশ্বের প্রথম দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে যুক্তরাজ্য, জার্মানী, আমেরিকা, কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্য-প্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের আরেকটি দেশ আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। এরপর আসবে বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর সুইজারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, জার্মানী, ত্রিনিদাদ, বেলজিয়াম এবং কানাডা যথাক্রমে এ স্থান দখল করেছে। যুক্তরাজ্য প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ১৩,৪০,০০০ চাঁদা দাতা অংশ গ্রহণ করেছে। গত বছরের চেয়ে এ সংখ্যা এক লক্ষ পাঁচ হাজার বেশি। সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে কানাডা, ভারত এবং যুক্তরাজ্য ছাড়াও আফ্রিকার গীনিকোনাকরি, ক্যামেরুন, গ্যাম্বিয়া, সেনেগাল, বেনিন, নাইজার, কঙ্গো কিনসাশা, বুরকিনা ফাঁসো এবং তানজানিয়া উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে।

নাইজেরিয়া এ বছর পুরোপুরি মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি। এজন্য তাদের সংখ্যার দিক থেকে চাঁদা দাতার সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। গত বছরের সংখ্যাও যদি থাকতো নাইজেরিয়ার এবং আরো দু'একটি দেশের, শুধু নাইজেরিয়ারই যদি হতো তাহলে ১৩,৪০,০০০ এর পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী ১৪,০০,০০০ হতো। এর অর্থ হল, সেখানে অনেক আলস্য প্রদর্শন করা হয়েছে বা সঠিক রিপোর্ট আসে নি বা রিপোর্ট নেয়া হয় নি। জামা'তের সদস্যদের আন্তরিকতার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাতে কোন ঘাটতি নেই, তা আফ্রিকা হোক বা অন্য কোন দেশই হোক না কেন। হয়তো সঠিকভাবে তাদের কাছে যাওয়া হয় নি বা এপ্রোচ (approach) করা হয় নি। সেক্রেটারীদের এই আলস্যই থেকে থাকে। রাবওয়া থেকে এক ব্যক্তি আমাকে লিখেছেন, পাড়ার প্রেসিডেন্ট সাহেব তার কাছে আসেন আর বলেন, আপনি ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা করেন নি, আর চাঁদাও দেন নি। তিনি বলেন, এটি কিভাবে হতে পারে? আমি রীতিমত চাঁদা দেই। তখন তিনি বলেন, এ বছর আমাদের ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী এত আলস্য দেখিয়েছে যে, পাড়ার কারো ওয়াদা নেয়া হয় নি আর সঠিকভাবে আদায়ও হয় নি। এটি থেকে বুঝা গেল যে, সেক্রেটারীদের আলস্যের কারণেই মানুষ বঞ্চিত থেকে যায়। নাইজেরিয়াতেও আমার মনে হয় এমনই হয়েছে। এছাড়া আমেরিকাতেও সংখ্যা কমেছে। অথচ সেখানে চাঁদা দাতার সংখ্যা কমার কোন বৈধ কারণ নেই। নাইজেরিয়াতেও এর কোন কারণ নেই। সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কিন্তু আমেরিকা, যেভাবে আমি বলেছি, মাথাপিছু কুরবানীর মানকে অনেক

বৃদ্ধি করেছে, মাশাআল্লাহ্। আর তারা রয়েছে প্রথম স্থানে। অনুরূপভাবে, সেসব দেশও চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিন, যাদের গত বছরের চেয়ে সংখ্যা কমেছে এবং নিজেদের দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি দিন। মানুষের ভিতর দুর্বলতা নেই, ত্রুটি রয়েছে কর্মীদের মাঝে।

ওয়াকফে জাদীদের একটি খাত হল সাবালকদের চাঁদার খাত। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জামা'তগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর। এরপর রাবওয়া, তারপর করাচী। পরবর্তী স্থানগুলোতে জামা'তগুলোর মাঝে যথাক্রমে রয়েছে ইসলামাবাদ, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, মুলতান, ওমর কোট, হায়দারাবাদ, পেশাওয়ার, মিরপুর খাস, উকাড়া এবং ডেরাগাজী খান।

আতফাল বিভাগ: শিশুদের আর্থিক কুরবানীতে লাহোর প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর যথাক্রমে রাবওয়া, করাচী, শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, হায়দারাবাদ, ডেরাগাজী খান, আযাদ কাশ্মীর, কোটলি, মিরপুর খাস, মুলতান এবং ভাওয়াল নগর।

মোট সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যান্ডের ১০টি বড় জামা'ত হল, ভোস্টার পার্ক, মসজিদ ফযল, তৃতীয় স্থানে রয়েছে বার্মিংহাম সাউথ, পাটনি, রেইঞ্জ পার্ক, ব্রেড ফোর্ড নর্থ, নিউ মলডেন, গ্লাসগো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট এবং জিলিং হাম।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে অঞ্চল গুলো হল, লন্ডন বি প্রথম স্থানে, তারপর লন্ডন এ, তারপর মিডল্যান্ডস্, নর্থ ইস্ট, এরপর সাউথ।

চাঁদা সংগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত হল, হ্যামবুর্গ প্রথম স্থানে রয়েছে, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, উইযবাদেন, ওমর ফিল্ডান, ডিসেন্ট বার্গ। আর মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে দশটি জামা'ত হল, যথাক্রমে রুইডোরমার্ক, নোয়েস, ফ্রেডবার্গ, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, হানাও, কোলন, কোবলেনয্, লোঙ্গান এবং মেহেদীয়াবাদ।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'ত হল, প্রথম স্থানে রয়েছে সিলিকন ভ্যালী, এরপর যথাক্রমে সিয়াটল, ডেট্রয়েট, সিলভাস্প্রিং, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলেস ইষ্ট, ডালাস, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং লওরার্ড।

কানাডার জামা'তগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে ক্যালগেরী, এরপর যথাক্রমে পিস ভিলেজ, ভোন, ভ্যানকুভার ও মেসিসাগা।

সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি বড় জামা'ত হল- ডারহাম প্রথম স্থানে, মিলটন ইষ্ট, সাস্কাটোন সাউথ, সাস্কাটোন নর্থ এবং ভিনজার। এরপর লাইডমিনিস্টার ওটোয়া ওয়েস্ট, ওটোয়া ইস্ট, বেরি, এরপর রয়েছে রিজাইনা।

আতফাল বিভাগে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামা'ত হল, যথাক্রমে ডারহাম, ব্র্যাডফোর্ড, সাস্কাটোন সাউথ, সাস্কাটোন নর্থ এবং লাইট মিনিস্টার।

অঞ্চলের দিক থেকে ক্যালগেরী প্রথম স্থানে, এরপর পিসভিলেজ, ব্রোমটন, ভোন এবং রয়েস্টান।

ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমটি হল, কেরালা, দ্বিতীয়ত জম্মু-কাশ্মীর, তৃতীয়স্থানে রয়েছে তামিলনাড়ু, কর্নাটক, কান্নাঙ্গানা, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের দশটি জামা'ত যথাক্রমে কেরোলায়ী প্রথমস্থানে রয়েছে, তারপর ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, পাথাপ্রেয়াম, কাদিয়ান, কানোল টাউন, কোলকাতা, বেঙ্গালোর, সোলোর এবং পেঙ্গাডী।

অস্ট্রেলিয়ার জামা'তগুলো হল, যথাক্রমে ক্যাসেল হিল, ব্রিসবেন লুগান, মার্সডেন পার্ক, বারবিক, প্যাজিট, এডলিট সাউথ, প্লামটোন, ক্যানবেরা, লাঙ্গওয়ারেন, এডিলেট ওয়েস্ট।

আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে অশেষ ও অঢেল বরকত দিন। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন, তারা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারে, যা ঘাটতি রয়েছে, তা যেন পুরণের চেষ্টা করে। বিশেষ করে চাঁদাদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। অর্থ তো বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু স্বল্প সামান্য অর্থ দিয়ে হলেও সবার অংশ গ্রহণ আবশ্যক।

নামাযের পর দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। প্রথমটি শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবার, যিনি সাহেবজাদা মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৩ ডিসেম্বর ৭৯ বছর বয়সে তিনি কানাডায় ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৩৫ সনে জুন মাসে ভাগালপুরে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম মৌলবী আবদুল বাকী সাহেব এবং তার মা সুফিয়া খাতুন সাহেবা। তার পিতা দীর্ঘ দিন কুনরিতে অবস্থিত জামা'তের ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন। দীর্ঘ দিন কুনরি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও কাজ করেছেন।

হযরত আলী আহমদ সাহেব ছিলেন তার দাদা, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। সাহাবী ছিলেন। তার বয়আতের ঘটনা আমাতুন নূর সাহেবা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা শুনেছি, তিনি যখন কাদিয়ান আসেন, তখন নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। কাদিয়ান যাওয়ার পর পথে অমৃতসর রেল স্টেশনে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। উত্তরে তিনি মৌলভী সাহেবকে বলেন, আমার মা সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পর আমাকে গবেষণার জন্য কাদিয়ান পাঠিয়েছে। আপনার এই আচরণের মাধ্যমে মির্যা সাহেবের সত্যতা আমার সামনে স্পষ্ট হয়েছে। আপনার মত এত বড় মৌলভী কোন মিথ্যা দাবিকারকের জন্য এত সময় কেন নষ্ট করবে? এভাবে আপনার ঘোরাফেরা করা আর সময় নষ্ট করা থেকে বুঝা যায়, মির্যা সাহেব সত্য।

১৯৬৪ সনের ৬ জানুয়ারি আসমা সাহেবার বিয়ে হয়। যেভাবে পূর্বেই আমি বলেছি, তিনি মির্যা খলীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। মির্যা খলীল আহমদ সাহেব হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পুত্র আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন, সাহেবজাদী আমাতুল হাই সাহেবার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয়া আসমা তাহেরা সাহেবা কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহর জেনারেল সেক্রেটারী আর সেক্রেটারী জিয়াফত হিসেবে, এছাড়া আন্তর্জাতিক

তবলীগি পরিকল্পনা কমিটির সদস্যা এবং স্থানীয় লাজনাতেও তার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে।

আসমা তাহেরা সাহেবার পিতা ১৯৭৫ সনে ইন্তেকাল করেন। এরপর মা তার সাথেই ছিলেন। আসমা তাহেরা সাহেবা যেহেতু আমার মামী ছিলেন, তাই আমি জানি, শ্বশুর বাড়ীতে তার ননদ এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার গভীর ভালোবাসা এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তার অসুস্থ্যতার সময় আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে এসেছি। বর্তমানে তিনি কানাডায় ছিলেন। তার অসুস্থ্যতার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আমি যখন তার কাছে যাই এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন তার জন্য নড়াচড়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তখনো তার বিনয়ের চিত্র দেখুন! তিনি বলেন, আমার কাপড় বের করে রাখ, প্রস্তুতি নাও, (আমার কথা বলেন,) হয়তো আমাকে তিনি সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। 'সাক্ষাতের জন্য আসুন' আমাকে এই বার্তা দেয়ার পরিবর্তে তিনি আশা করছিলেন, হয়তো আমিই তাকে ডেকে পাঠাব। যাহোক, আমি তার সাথে দেখা করেছি। খুবই আনন্দিত ছিলেন। তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, বোনের এক মেয়েকে তিনি লালন-পালন করেছেন। পাঁচ বছর বয়সেই সে তার কাছে আসে। তিনি বলছেন যে, আমাকে নিজ সন্তানের মত লালন-পালন করেছেন আর বিয়ের সময়েও আমার বিয়ের সকল ব্যবস্থা তিনিই করেছেন। আমার তরবীয়ত এবং শিক্ষায় কোন ঘাটতি তিনি রাখেন নি। আমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে আমাকে নির্দেশ দিতেন, দোয়া কর, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। দোয়াতে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বাচ্চাদের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, তাদের তরবীয়তের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। তিনি বলতেন, সন্তানদেরকে মসজিদের নিয়ে যাবে। কেননা, তাদেরকে যদি মসজিদে ব্যস্ত রাখ, তাহলে বাচ্চারা কখনোই বখে যাবে না এবং নষ্ট হবে না। জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত সব সময় করতেন। এই মেয়ে বলছে যে, আমাকে ওসীয়্যত করার জন্যেও নসীহত করেছেন। আর সব সময় এই নসীহত করতেন যে, জামা'তের সাথে সর্বাবস্থায় সম্পৃক্ত থাকবে। কাজের লোকদের সাথেও উত্তম আচরণ করতেন। ঘরে কাজের মেয়ে ছিল, তার সম্পর্কে তার এই পালিত কন্যাকে বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তার যত্ন নিবে। আমি তাকে বাড়িতে যে কোয়ার্টার দিয়েছি, সেখান থেকে তাকে বের করে দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা তার রূহের মাগফিরাত করুন এবং তাঁর করুনায় সিক্ত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, জনাব চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের। ৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে লাহোরে তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব-এর দাদা হযরত চৌধুরী নাসরুল্লাহ খান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার নানা ছিলেন চৌধুরী ফাতেহ মোহাম্মদ সিয়াল সাহেব। তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান সাহেব দীর্ঘদিন করাচি জামা'তের আমীর হিসেবে কাজ করেছেন। চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব তার জেঠাও ছিলেন আর শ্বশুরও ছিলেন। ১৯৬৪ সনে চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেবের বিয়ে হয় আমাতুল হাই সাহেবার সাথে, যিনি চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব-এর কন্যা ছিলেন। তার সন্তানরা হলেন, মোস্তফা নাসরুল্লাহ খান এবং ইব্রাহীম নাসরুল্লাহ্ খান, যিনি ১৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আর আয়শা নাসরুল্লাহ্ হলেন তার এক কন্যা। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ সাহেবের সাথে চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের মেয়ের যে বিয়ে হয়েছিল, ইতিপূর্বে ডাক্তার এজাজুল হক সাহেবের সাথেও তার বিয়ে হয়েছিল। সেই ঘরে তার দুই ছেলে ছিল, মুহাম্মদ ফজল হক এবং আহমদ নাসরুল্লাহ্। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সনে আহমদ নাসরুল্লাহ্‌কে লাহোরে শহীদ করা হয়েছিল। এখন তার দুই পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে। স্ত্রীর প্রথম ঘরের সন্তানদেরকেও অত্যন্ত স্নেহের সাথে আপন পুত্রদের মত কাছে রেখেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৫ সনে তাকে জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীর নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ৩৪ বছর জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের আমীরের পদ অলংকার করে রেখেছিলেন। ২০০৯ সন হতেই তার স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। আমার কথায় অর্থাৎ, আপনি দেখুন, কাজ করতে পারবেন কি-না। তখন তিনি বলেন, ঠিক আছে! আমি অপারগ। অপারগ এই অর্থে যে, স্বাস্থ্য ভাল নয়, এমারতের কাজ অনেক ব্যাপক। এরপর শেখ মুনীর সাহেব সেখানে নতুন আমীর নিযুক্ত হন, যিনি ২০১০ সনে শাহাদত বরণ করেন। ২০০৮ বা প্রায় ২০০৯ সন পর্যন্ত তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৭৪ সনের বিরোধিতাপূণ পরিস্থিতিতে তিনি যথারীতি আমীর পদে না থাকলেও খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তার উপর অনেক দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। আর তিনি তা সুচারুরূপে পালন করতেন। ১৯৭৪ সনে হাইকোর্টে যখন জাষ্টিস সামদানী ইনকোয়ারী কমিশন গঠিত হয়, তখন তাতেও তার সেবার খতিয়ান ছিল অনেক দীর্ঘ। ১৯৭৪ সনের পরীক্ষার যুগে লাহোরের কেন্দ্রীয় শরীয়া আদালতে যে মামলাটি চলছিল, সেখানেও তিনি অনেক সেবা করেছেন। তিনি আরেকটি মহাসম্মানও লাভ করেছেন আর তা হল, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তান থেকে হিজরতের সময় তিনি রাবওয়া থেকে লন্ডন পর্যন্ত হুযূরের সাথেই ছিলেন। বরং আমার জানা মতে, রাবওয়া থেকে করাচি পর্যন্ত তিনিই গাড়ি চালিয়েছেন। তার এমারতকালে লাহোরের দারুয্ যিকর ব্যাপকতা লাভ করেছে আর এখনো তা অব্যাহত আছে। সেই যুগে, অনেক কাজ হয়েছে। তার এমারতকালে লাহোরে অনেকগুলো নতুন নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং জামা'তে আহমদীয়া লাহোর উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানীর সৌভাগ্য পেয়েছে। গত ৩২ বছর থেকে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রধান হিসেবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। ১৯৮৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ড হিজরতের সময় যেভাবে আমি বলেছি, তার সাথী হওয়ার সম্মান তিনি লাভ করেছেন। লেইন এ্যাডামসনের (Iain Adamson) যে বই আছে, তাতেও তিনি তার কথা উল্লেখ করেছেন।

লাহোরের সেক্রেটারী উমরে আমা চৌধুরী মনোয়ার সাহেব লিখেন, হামীদ নাসরুল্লাহ

খান সাহেব তার সহকর্মীদের প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন, তাদের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র প্রয়োজনের প্রতিও অনেক যত্নবান ছিলেন। কোন পরামর্শ চাওয়া হলে অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলেন, ৯ বছর আমি লাহোরের জেলা কায়েদ হিসেবে কাজ করেছি, কিন্তু কখনোই তিনি কোন বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে অনেক বেশি সহযোগিতা করতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার পাঁচটি ইজতেমা লাহোরের বাহিরে করানোর সুযোগ হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে তিনি আমাদের গভীর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দিতেন। চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব খুব ভালো একজন ব্যবস্থাপকও ছিলেন আর যথা সময়ে এবং যথাস্থানে তিনি কাজ সম্পন্ন করতেন। সব জামা'তে সফর করতেন, হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। আমেলার সদস্যদেরকে তিনি তার বন্ধু এবং বাহু জ্ঞান করতেন।

হাকীম তারেক সাহেব লিখেন, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে খিলাফতের আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিল। জামা'তের কর্মী এবং খাদেমদের সাথে খুবই নম্র এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। তাদেরকে তিনি অনেক বিশ্বাস ও সম্মান করতেন। প্রথমে আমার নায়েরে আলা থাকা কালীন সময়ে আমার সাথে যতদিন তিনি আমীর হিসেবে কাজ করেছেন, সেখানেও কেন্দ্রের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা এবং আনুগত্যের সাথে কাজ করেছেন। আমার নায়েরে আলা থাকা অবস্থায়ও তিনি আমার সাথে কাজ করেছেন এবং খিলাফতের আসনে আসীন হওয়ার পরও যতদিন তিনি লাহোরের আমীর ছিলেন, পূর্ণ সহযোগিতার চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন। তার মাঝে গভীর আনুগত্যের চেতনা ছিল।

লাহোর জেলার নায়েব আমীর কর্ণেল নাঈম সিদ্দিকী সাহেব লিখেন, খিলাফতের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘটনা বলা শুরু করলে বলতেই থাকতেন। কর্ণেল নাঈম সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন যে, একবার তিনি ভাওয়ালপুরে কোন কাজে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বার্তা পান যে, রাবওয়ায় পৌঁছুন। ভাওয়ালপুর পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রাবওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রাতের বেলা রাবওয়া পৌঁছান। ফযরের পূর্বেই রাবওয়া পৌঁছে তিনি বাহিরে পায়চারী আরম্ভ করেন। যখন দেখেন, এটি তাহাজ্জুদের সময়, তাহাজ্জদ বা ফযরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়, তখন তিনি হুযূরকে পয়গাম পাঠান যে, আমি পৌঁছে গিয়েছি।

গরীবদের নামে তিনি বৃত্তি চালু করেছিলেন। কেবল নিজের পক্ষ থেকেই নয়, বরং তার স্ত্রী, তার পিতা এবং চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের পক্ষ থেকেও বৃত্তি চালু করেছিলেন। যখনই কারো আবেদন আসত, তিনি মার্ক করে বলতেন যে, আমার খাতা বা স্ত্রীর হিসাব বা অন্য কোন হিসাব থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হোক। এটিও তিনি সঠিক লিখেছেন যে, হামীদ নাসরুল্লাহ খান সাহেব জামা'তে আহমদীয়া লাহোরের ইতিহাস ছিলেন। যাহোক, খোদার পক্ষ থেকে তিনি নেতৃত্বের বশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিলেন আর এর সঠিক ব্যবহারও করতেন।

ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারী নাসির শামস সাহেব লিখেন। (যেভাবে আমি বলেছি, তিনি ৩২ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।) চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেবের ইন্তেকালের পর ১৯৮৬ সনে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় ৩২ বছর ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি খুবই সহানুভূতিশীল, সহমর্মী, স্নেহশীল, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং হাসি-খুশী মানুষ ছিলেন। তার সম্পর্কের গন্ডি ছিল অনেক ব্যাপক আর এই সম্পর্ককে সব সময় জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিত-প্রাণ, জামা'তের সেবক, খলীফাগণের সুলতানে নাসীর, খিলাফতের জন্য পরম আত্মাভিমানী এবং বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন মিটিং-এ যোগদান করতেন, সঠিক মতামত ব্যক্ত করতেন এবং বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন করার যোগ্যতা রাখতেন। খোদা প্রদত্ত যোগ্যতায় কোন বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। মির্যা নাদীম সাহেব লিখেন, তিনি নিজে আমাকে শুনিয়েছেন, ১৯৭৫ সনে তাকে যখন লাহোরের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তিনি খুবই ভয় এবং শঙ্কা নিয়ে রাবওয়ায় হযরত খলীফা সালেস (রাহ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের অনুরোধ পাঠান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, কী কারণে আর কিভাবে এলেন? তিনি বলেন, আমি এই পদের যোগ্য নই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, খাবারের সময় হচ্ছে, প্রথমে খাবার খাও। চৌধুরী সাহেব তখনো তার কথা বার বার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তিনি বলেন, এরপর খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, যুগ খলীফা তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছেন আর আল্লাহ্‌র খলীফা ভালো জানেন। তিনি বলেন, এরপর কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে কখনোই আমি আর ভয় পাই নি। খিলাফতের দোয়ার কল্যাণে আমার সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দায়ার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততিকেও বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত এবং জামা'তের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত রাখুন এবং তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ জানুয়ারি- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, ২৪তম খণ্ড, সংখ্যা ৪, পৃ. ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

Published
September 6, 2017

Head of Ahmadiyya Muslim Community condemns persecution of Rohingya Muslims

The Ahmadiyya Muslim Community condemns in the strongest possible terms the persecution of the Rohingya Muslims in Myanmar (Burma).

It is being reported that scores of Muslims are being killed and tortured, whilst many thousands have been driven out of their homes and forced to flee. Such treatment can only be described as an affront to humanity.

The Ahmadiyya Muslim Community urges the international community to help the Muslims in Myanmar attain their basic human rights and freedoms.

The World Head of the Ahmadiyya Muslim Community, the Fifth Khalifa (Caliph), His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad has said:

"All Ahmadi Muslims are extremely grief-stricken to hear of the cruel treatment inflicted upon the Rohingya Muslims in Myanmar and we pray that all of these cruelties and injustices come to an immediate end.

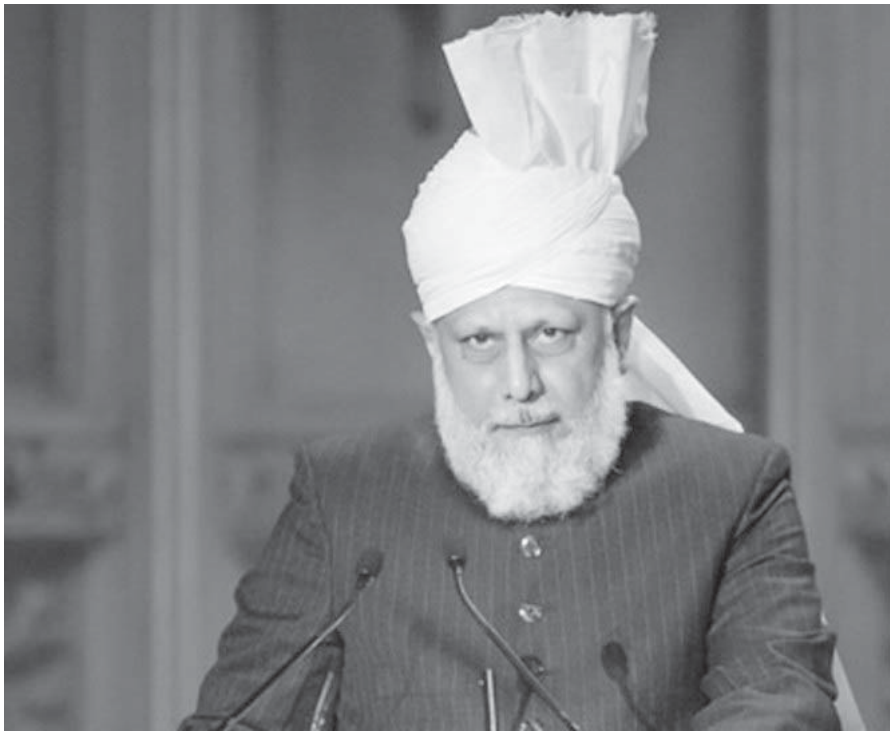

The fact that these Muslims are being targeted seemingly with impunity is a result of the division and sectarianism within the Muslim world itself. If there was unity amongst Muslim nations and communities, such tragedies would never unfold.

On behalf of the Ahmadiyya Muslim Community, I hope and pray that the international community comes together to help the Muslims in Myanmar and in this effort the Muslim nations should be at the forefront.

I pray that the persecution of the Muslims in Myanmar, and indeed of all people who are denied their religious rights in the world, comes to an end. We believe that all people should be free to practice their faith or beliefs without any fear and that all people should be equal under the law of their land."

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
বুধবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রোহিঙ্গা নির্যাতনে আহমদীয়া মুসিলম সম্প্রদায় প্রধানের নিন্দা

আহমদীয়া মুসিলম সম্প্রদায় মায়ানমার (বার্ম)-এ রোহিঙ্গা মুসলমানেদর উপর নিপীড়নের বিষেয় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

গংবাদে প্রকাশিত হচ্ছে যে বহুল সংখ্যায় মুসলমান নিহত ও নিপীড়িত হচ্ছেম আর হাজার হাজার মানুষকে তাদের নিজ ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। এমন আচরণকে কেবল মানবতার নামে এক কলঙ্ক হিসেবেই বর্ণনা করা যেতে পারে।

মায়ানমারের মুসলমানেরা যেন তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ অর্জন করতে পারে সে জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান, পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মায়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতনের সংবাদ সকল আহমদী মুসলমান গভীরভাবে শোকাহত এবং অবিলম্বে এ সকল নিপীড়ন ও অবিচার অবসানের জন্য আমরা দোয়া করছি।

আজ এ মুসলমানদের এমন বেপরোয়া নিপীড়নের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে তা মূলতঃ মুসলিম বিশ্বে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য এবং পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই ফল। যদি আজ মুসলিম জাতি-সম্প্রদায়গুলোর মাঝে একতা থাকতো, তবে এমন দুর্দশা কখনোই হত না।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে আমি আশা করি এবং দোয়া করি যেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মায়ানমারের মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়ান, আর এ প্রয়াসে মুসলিম দেশগুলোর অগ্রণী ভূমিকা থাকা উচিত।

আমার দোয়া এই যে, মায়ানমারের মুসলিম সম্প্রদায়সহ বিশ্বের সকল মানুষ যারা তাদের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের সেই বঞ্চনার অবসান হোক।

আমরা বিশ্বাস করি যে সকল মানুষের নির্ভয়ে তার নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস পালনের অধিকার থাকা উচিত আর সকল মানুষেরই নিজ দেশে আইনের চোখে সমান হওয়া উচিত।"

নির্মম নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের দুর্দশার খণ্ডচিত্র

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

মানব জাতির সুরক্ষায় এক সতর্কবাণী

হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) ১৯০৬ সালে জগদ্বাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন–

তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কখনো না! সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে।

হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি, জনপদগুলোকে জনমানবশূন্য প্রত্যক্ষ করছি।

সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নীরবে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাষ করবেন। যার শোনার মত কান আছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর, অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা, সে জীবিত নয়, মৃত।

(হাকীকাতুল ওহী, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২১৫)

হারিকেন ইরমার আঘাতে আমেরিকার উপকুল অঞ্চলের বড় বড় শহর ও জনপদ এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে দ্বীপদেশের বিধ্বস্ত অবস্থার খণ্ডচিত্র

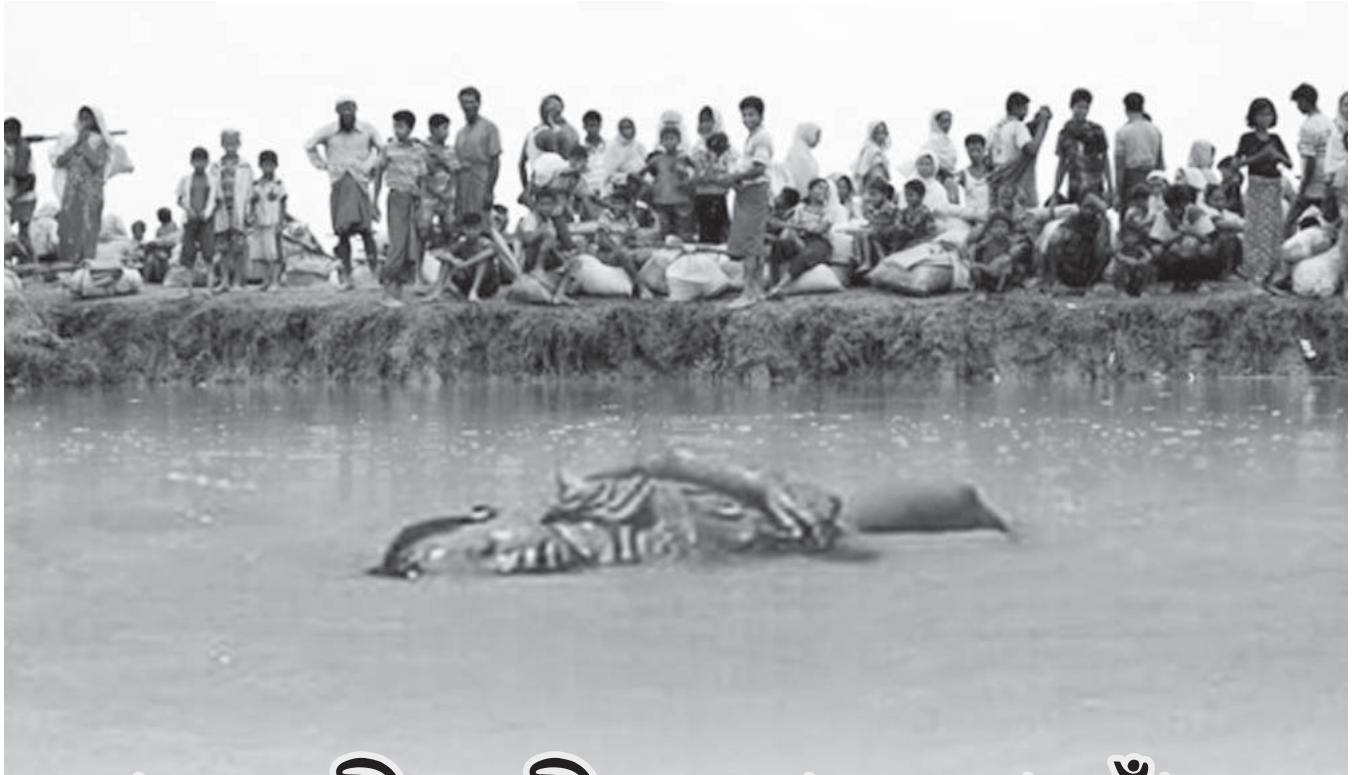

নাফ নদীর তীরে মানবতা কাঁদে

মাহমুদ আহমদ সুমন

গত ২৪ আগস্ট রাত থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রাখাইনে নতুন করে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, জ্বালাও পোড়াও শুরু করেছে রোহিঙ্গাদের ওপর। গত শুক্রবার (৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭) বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উপকূলে ভেসে আসা এক রোহিঙ্গা শিশুর লাশ পড়ে থাকতে দেখে দু'চোখ ভরে যায় অশ্রুতে, হায় মানবতা! এমনই নিষ্পাপ শিশুদের লাশ পানি থেকে তুলে মাথায় নিয়ে আসার দৃশ্য প্রতিদিন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। শতশত লাশ বিশ্ব বিবেককে এতটুকু বিচলিত করতে পারছে না। বিশ্ব বিবেকের যেন আজ মৃত্যু ঘটেছে। বছর দুয়েক আগে সমুদ্র সৈকতে নিথর হয়ে পড়ে থাকা শিশু আয়লানের লাশ দেখে বিশ্ব বিবেক কেঁপে উঠেছিল। সৈকতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা তার এ ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে বিবেকবানদের অন্তরে তা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। আয়লানের মতো এমন অনেক রোহিঙ্গা শিশুর লাশ গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে ভেসে আসতে দেখা যায়। যে দেশের নাগরিক তারা, সে দেশেরই সরকার তাদের ওপর গণহত্যা চলাচ্ছে। দেশটির সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনী এতটাই নৃশংস ও বর্বর ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে যে, তার নজির সমসাময়িক কালে বিরল। অথচ বিশ্ব-বিবেক যেন নির্বিকার।

রোহিঙ্গা কারা? ইতিহাস থেকে জানা যায়, রোহিঙ্গারা পশ্চিম মিয়ানমারের রাখাইন স্টেটের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জনগোষ্ঠী। এদের বেশির ভাগই মুসলমান। রাখাইন স্টেটের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো রোহিঙ্গা। সংখ্যায় প্রায় ২০ লাখ। মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও উগ্র রাখাইনদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণের শিকার হয়ে প্রায় ১০ লাখের মতো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। প্রাথমিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যীয় মুসলমান ও স্থানীয় আরাকানিদের সংমিশ্রণে রোহিঙ্গা জাতির উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে চাটগাঁইয়া, রাখাইন, আরাকানি, বার্মিজ, বাঙালি, ভারতীয়, মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষের মিশ্রণে এই জাতি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

রোহিঙ্গাদের বসবাসস্থল রাখাইন রাজ্য। এর আদি নাম আরাকান। এ নামকরণ প্রমাণ করে মুসলিম ঐতিহ্যের কথা। কারণ ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তিকে একত্রে বলা হয় আরকান। আর এই আরকান থেকেই

তার অনুসারী মুসলমানদের আবাস ভূমির নামকরণ করা হয়েছে আরাকান।

ধারণা করা হয়, রোহিঙ্গা নামটি এসেছে আরাকানের রাজধানীর নাম ম্রোহং থেকে: ম্রোহং>রোয়াং>রোয়াইঙ্গিয়া>রোহিঙ্গা। তবে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আরাকানের উল্লেখ রয়েছে রোসাং নামে। (সূত্র : রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস, এন. এম. হাবিব উল্লাহ্)

রোহিঙ্গারা বহু বছর ধরেই জুলুম নির্যাতনের শিকার। রোহিঙ্গারা সর্বপ্রথম জুলুমের শিকার হয় ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। বার্মার খ্রিষ্টান রাজা সে সময় আরাকান দখল করে নেন। এরপর রোহিঙ্গারা বড় ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় ১৯৪২ সালে, যখন জাপান বার্মা দখল করে নেয়। এসব নির্যাতনের সব মাত্রা ছাড়িয়ে রোহিঙ্গাদের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু হয় ১৯৬২ সালে, সামরিক জান্তার ক্ষমতা দখলের পর থেকে। নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করে ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের ফলে। এ আইন কার্যকর হওয়ার পর বাতিল হয়ে যায় রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব। তখন থেকে মানুষ হিসেবে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকারও অচল হয়ে পড়ে। তারপর সামরিক জান্তা 'কিং ড্রাগন অপারেশন' নামে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে ভয়াবহ অভিযান শুরু করে। সেই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৯০ এবং ২০১২ সালে রোহিঙ্গা উচ্ছেদে বর্বরতম অভিযান পরিচালনা করে বার্মার সামরিক জান্তা। এরফলে বিভিন্ন সময় হাজার হাজার রোহিঙ্গা জীবন রক্ষার্থে বাংলাদেশে এসে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গারা রয়েছে। বিভিন্ন সময় সামরিক জান্তার নির্যাতনের কারণে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে মালয়েশিয়ায় প্রায় ৫০ হাজার, বাংলাদেশে পাঁচ লাখ; অবাক হওয়ার মতো তথ্য হলো, সৌদিতেও রয়েছে রোহিঙ্গারা। সৌদিতে রোহিঙ্গাদের সম্ভাব্য সংখ্যা পাঁচ লাখেরও বেশি। যুগের পর যুগ তারা এ দেশে বসবাস করছে। তাদের মধ্য থেকে প্রায় দুই লাখ লোককে সৌদি সরকার সম্প্রতি ইকামা (রেসিডেন্সি-পারমিট) প্রদান করেছে। উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা, স্বাভাবিক জীবনযাপন ও সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়া। বিভিন্ন জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে তাদের অনেকে জড়িয়ে গেলেও আরবের মাটিতে এ জাতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে অনেকেই। জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। কাজ করে দেখিয়েছে। তাদের ভেতরে মসজিদে নববীর সাবেক ইমাম শাইখ কারি মুহাম্মদ আইউব (রহ.), কারি আব্দুল আলী আরাকানি, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মুহিব্বুদ্দীন আব্দুস সুবহান, মুহাম্মদ ইউসুফ বার্মাভিসহ অনেকেই উল্লেখযোগ্য।

যদিও রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশের কিছু শঙ্কা রয়েছে। তথাপি মানবিকতার দাবি হলো, নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানো। বাংলাদেশের সরকার ও জনগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। কিন্তু তাদের জন্য স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের পক্ষে খুবই কঠিন। আগে থেকেই কয়েক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে জনসংখ্যার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্যদিকে ইয়াবা, অস্ত্র ও মানবপাচারের মতো সংঘবদ্ধ আপরাধের পাশাপাশি বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলায় রোহিঙ্গাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে বলে খবর বেরিয়েছে। কোনো কোনো নিরাপত্তাবিশ্লেষকের ধারণা, বাংলাদেশের একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী মিয়ানমারের সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে কক্সবাজার ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম নিয়ে একটি স্বাধীন রোহিঙ্গা রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। পত্র-পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, স্বাধীন রোহিঙ্গা রাষ্ট্র গঠনের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বান্দরবান ও নাইক্ষ্যংছড়ির গভীর অরণ্যে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে প্রগতিশীল বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

তা যাইহোক, রোহিঙ্গাদের ওপর এমন নির্মম অত্যাচার আমরা আর সইতে পারছি না। মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন- 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান/নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,/সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।' আমরা সবাই আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানবতার বিষয়টি সর্বপ্রথমে দেখার বিষয়।

অপর দিকে 'অহিংসা পরম ধর্ম', 'জীব হত্যা মহাপাপ' এসব নীতিকথা বলে গেছেন গৌতম বুদ্ধ। মানবতাবাদী হিসেবে জগৎসংসারে তিনি বেশ খ্যাতিও কুড়ান। প্রবর্তন করেন বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্ম অনুসরণ করে মিয়ানমারের বেশির ভাগ মানুষ। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি মিয়ানমারে? তারা আজ তাদের নীতিকথা থেকে সম্পূর্ণ দূরে।

এদিকে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলিফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। লন্ডনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্যবৃন্দ মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর পরিচালিত বর্বর ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করছে এবং অতিসত্তর এর অবসানের আহবান জানাচ্ছে।'

হুযূর (আই.) বলেন, 'নির্বিচারে হত্যা এবং বর্বর ও অমানবিক নিপীড়নের ফলে আজ হাজার হাজার রোহিঙ্গা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। রোহিঙ্গ্যা মুসলমানদের সহায়তা প্রদান ও তাদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহবান জানান।'

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন, 'মুসলিম বিশ্বে নিজেদের মাঝে অনৈক্য, বিভেদ এবং পারস্পরিক সম্প্রদায়িক মনোভাব এবং কোন কোন দেশের শাসক বর্গের কৃতকর্মের কারণে মুসলমানরা আজ নানা দেশে নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

বিশ্বের সকল আহমদী মুসলমানের পক্ষ থেকে আমি আশা করি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিয়ানমারের নির্যাতিত মুসলানদের পাশে এসে দাঁড়াবেন আর এক্ষেত্রে মুসলিম দেশগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।' (সূত্র:

দৈনিক পূর্বকোণ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, পৃ. ১০)

আল্লাহপাকের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও মানুষ আজ দ্বিধা করছে না। সব ধর্মই চায় শান্তি, সব মানুষ চায় শান্তি অথচ আজ প্রতিটি মানুষ চরম অশান্তির মাঝে দিনাতিপাত করছে। আর এমনটি হওয়ারই কথা। কেননা, সমগ্র মানবজাতি একে অপরের ভাই। সবার সৃষ্টি একই উৎস থেকে। আল্লাহপাক সমস্ত আদম সন্তানকে প্রভূত সম্মান ঠিকই দান করেছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই সম্মান ধরে রাখতে পারি নি। সব আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। একজন মানুষ সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার মূল পরিচয় হলো সে আদম সন্তান আর আদম সন্তান হিসেবে সব ধর্মের মানুষ একই উম্মত। আল্লাহপাকের কাছে সবাই সম-মর্যাদার অধিকারী। মানুষ হিসেবে তিনি কাউকে পৃথক করেন নি। তার দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং একই উম্মাহ কিন্তু পরবর্তিতে মানুষ বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে, 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো' (সূরা ইউনুস, আয়াত: ২০)। কারো কষ্ট দেখে আমরা শান্তিতে নিদ্রাযাপন করতে পারি না। দেহের কোন অঙ্গে যদি আঘাত লাগে তাহলে পুরো দেহই যেমন ব্যাথা অনুভব হয়, তেমনি কষ্ট অনুভূত হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ওপর বর্বর নির্যাতনে। শিশুদের লাশ দেখে আজ কাঁদছে মানুষ, কাঁদছে মসজিদ, কাঁদছে মন্দির, কেউ যেন আজ শান্তিতে নেই। মানুষের মনে আজ শুধু আহাজারি আর আহাজারি।

যতদিন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে না ততদিন পৃথিবী অশান্তই থাকবে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত তখনই হতে পারে যখন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে। মানুষের মাঝে মমত্ববোধ জন্ম না নিলে সে মানুষ হয় কীভাবে। সবার সাথে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন মানুষ হিসেবে তার প্রতি প্রীতিময় সম্পর্ক রাখার শিক্ষাই পবিত্র কোরআন বরং সকল ধর্ম দেয়। কবি নজরুল যথার্থই বলেছেন, 'কাহারে করিছ ঘৃণা ভাই, কাহারে মারিছ লাথি? হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি।' আবার তিনি গেয়েছেন- 'তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি, তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী, মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা, সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা, বেহেশত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত। ক্ষমা করো হজরত।'

ধর্ম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। ধর্ম মূলত শান্তি-প্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোনো ক্রমেই ধর্ম সমর্থন করে না–একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে। যদি আমার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ না থাকে তাহলে আমার কার্য প্রমাণ করে যে, আমি কোনো ধর্মেরই অনুসারী নই। আমাদের প্রত্যেককে ভেবে দেখতে হবে, আমি যে কাজ করছি তা কি আমার ধর্মে অনুমতি আছে?

চূড়ান্ত কথা হলো, সবারই সৃষ্টি যেহেতু একই ঐশী উৎস থেকে তাই সকলের মূল কাজ হলো সবার মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রাখা। হে আদম সন্তান! হে মানুষ! আসুন, ধর্মের নামে রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করে মানবতার গান গাই।

masumon83@yahoo.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা অবগত আছেন, বছরের প্রথমেই হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, জামাতের কেউই যাতে তাহরীক-ই-জাদীদ চাঁদার বাইরে না থাকেন। মনে রাখবেন, নবজাতক থেকে বৃদ্ধ কাউকেই এর ফজিলত থেকে বঞ্চিত করবেন না। নওমোবাইনদেরও একই ভাবে শরীক করুন। মৃত পিতা-মাতা, দাদা দাদী বা নিকটাত্মীয়-স্বজনের নামে এই চাঁদা দিয়ে তাদেরকেও জীবিত রাখার নির্দেশনা রয়েছে। চাঁদা যে কোন পরিমাণই হোক না কেন প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

আপনাদের সকলের নিকট বিনীত আবেদন, অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে এই তাহরীকে জদীদের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর শেষ হতে চলেছে। অতএব আপনারা অতিসত্বর চাঁদা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং **অক্টোবর মাসের প্রথম দশ দিন চাঁদা আদায়ের জন্য আশারা পালন করুন।** জামাতের সাথে যাদের যোগাযোগ তেমন একটা নেই তাদের নিকটও খলীফার এই পয়গাম পৌঁছান এবং তাদেরকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন (চাঁদা যত টাকাই দিন না কেন)। এ ব্যাপারে জামাতের সকল অঙ্গ সংগঠন ও মুরুব্বী মোয়াল্লেমদের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট আগামী ২০ অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করুন, যাতে যথা সময়ে হুযূর (আই.) এর দপ্তরে রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়। আমাদের এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট হই এবং হুযূরের দোয়া ও বরকতের অংশীদার হই।

শহীদুল ইসলাম
সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
প্রয়োজনে : ০১৭১৪০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(১৬তম কিস্তি)

নারীর সব অধিকার

আপনারা নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারীর অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কথা শুনে থাকবেন। এই ব্যাপারে ইসলাম একটা ব্যাপক মৌলিক নীতির কথা বলে যার মধ্যে সব কিছুই আছে:

"...এবং ন্যায় সঙ্গতভাবে কতক অধিকার নারীদের জন্য (পুরুষদের ওপর) আছে যেরূপে কতক অধিকার (পুরুষদের জন্য) নারীদের ওপর আছে।' (অর্থৎ নারীদেরও ঠিক পুরুষদের ওপর সমান অধিকার আছে, যেমন আছে পুরুষদের অধিকার নারীদের ওপর। সুতরাং, মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে নারীও পুরুষের মধ্যে না আছে কোন প্রকারের কোনও অসমতা, না কোনও তারতম্য।) কিন্তু নারীদের ওপর (এক প্রকার) প্রাধান্য আছে পুরুষদের। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (২:২২৯)

কুরআন করীমের অন্য একটি আয়াতের একাংশে বলা আছে:

'পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের ওপর অভিভাবক (করা হয়েছে) কেননা আল্লাহ্ তাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব (প্রাধান্য) দিয়েছেন এই কারণে যে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে (নারীদের জন্য) খরচ করে'। (সূরা নিসা- ৪:৩৫)

আরবী 'কাউয়ামুনা' (অভিভাবকরা যারা তাদের পোষ্যদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্য দায়ী) শব্দটি থেকে অনেক আলেম (মধ্যযুগীয় মনোভাবাপন্ন) নারীর ওপরে পুরুষের নিরংকুশ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চান। অথচ, আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, পোষ্যদের ওপরে উপার্জনকারীদের একটা প্রধান্য রয়েছে। সুতরাং পোষ্যরা যাতে সঠিক পথে চলে সেজন্য নৈতিক চাপ সৃষ্টি করবার একটা বাড়তি সুবিধা বা এখতিয়ার রয়েছে অভিভাবকদের।

মৌলিক মানবাধিকারের প্রশ্নে এখানে কোনভাবেই একথা বলা হয়নি যে, নারীদের অধিকার সমান নয়, কিংবা নারীদের ওপরে পুরুষদের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আয়াতের শেষাংশে ওপরে উল্লেখিত এখতিয়ারের কথাই বরা হয়েছে এবং পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষদের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, নারিদের মৌলিক অধিকার ঠিক পুরুষদেরই সমান সমান। আরবী 'ওয়া' অক্ষরের তর্জমা হবে এখানে, 'এই কারণে' অথবা 'যখন'-'যতক্ষন পর্যন্ত' এবং এটাই এখানে নির্ভুল তর্জমা।

একাধিক বিবাহ

পশ্চিমা দেশগুলোতে এটা একটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের এই বিষয়টি (পুরুষ কর্তৃক একই সঙ্গে একাধিক বিবাহ) সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে গেলেই তাকে যে প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয়, তা হচ্ছেঃ ইসলাম কি কোন পুরুষকে চার বার বিয়ে করার এবং একই সঙ্গে চার জন স্ত্রী রাখবার অনুমতি দেয়? পাশ্চত্য জগতের বহু জনসভায় এবং আমন্ত্রিত বুদ্ধিজীবিদের বহু বিশিষ্ট সম্মলনে বক্তৃতা করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা আমার আছে। কোথাও কখনও এই প্রশ্নটি তোলা হয়নি, এনম ঘটনা আমার মনে পড়ে না।

প্রায় ক্ষেত্রে কোন না কোন মহিলা দাঁড়িয়ে পড়েন এবং অবশ্যই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সরল মনেই প্রশ্ন করেন যে, ইসলাম চারজন স্ত্রী রাখবার অনুমতি দেয় কি না। উত্তর তো এমনিতে সবারই জানা। তবে, ইসলামের এই বিষয়টিই পাশ্চাত্য দুনিয়ায় 'সম্ভবতঃ' সব চাইতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত। আর একটা বহুল প্রচারিত বিষয় হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ, যদিও এর সঙ্গে ইসলামের কোন সংশ্রব নেই। (দ্রঃ 'Murder in the name of Allah' by the Speaker) ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে কী সমানাধিকার দেয়, যখন তা একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী রাখবার এবং একজন নারীকে মাত্র একজন স্বামী রাখবার অনুমতি দেয়? এই প্রশ্নটি পূর্বোক্ত প্রশ্নটির একটা ভিন্নরূপ যা কিনা, আমরা বিশ্বাস, কাজে লাগান হয় শুধু ইসলাম সম্পর্কিত ভাল ধারণাকে নস্যাৎ করার একটা অজুহাতরূপে এবং যা হয়তো অনেক প্রশ্নকর্তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই করেন। স্বল্প আনুষ্ঠানিক বৈঠকগুলোতে, যেখানে ভদ্রতা বা শিষ্টাচার তেমন একটা মনে চলা হয় না, সেখানে প্রশ্নটা মাত্র সাধারণ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না, ঠাট্টাবিদ্রুপেরও রূপ নেয়।

কয়েক যুগ আগের কথা, তখন আমি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সোস' (SOAS= School of Oriental and African Studies)-এর ছাত্র ছিলাম। একজন পাকিস্তানী ছাত্রকে তার সহপাঠী এক ইংরেজ ছাত্র প্রায়শঃ ঐ প্রশ্নটি তুলে জ্বালাতন করতো, এবং এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতো। একদিন আমার মনে আছে পাকিস্তানী

ছাত্রটি, সম্ভবতঃ, তার ওপরে বেশী চাপ সৃষ্টি করার দরুন, সহসা ইংরেজ ছাত্রটিকে প্রশ্ন করে বসলোঃ আচ্ছা, কোসরা কো আমাদের চার স্ত্রী রাখার ব্যাপারে আপত্তি তোল, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের তোমাদের চার পিতা রাখার ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন তোল না? (পাকিস্তানী ছাত্রটি ইংরেজি Forefather শব্দটিকে Four Father রূপে ব্যবহার করেছিল 'চার' (Four= Fore) শব্দটির ওপরে সে এমনভাবে জোর দিয়ে কৌতুক সহকারে উচ্চারণ করেছিল যে, ইংরেজ ছাত্রটি থতমত খেয়ে গিয়েছিল এবং ব্যাপারটা সাংঘাতিকভাবে পাল্টে গিয়েছিল। দৃশ্যতঃ ব্যাপারটা ছিল একটা মস্কারা মাত্র। কিন্তু আপনি যদি এটাকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, এর মধ্যে মাস্কারার চাইতে বেশী আরও কিছু ছিল। কেননা, এর মধ্য দিয়ে সমাজে বিরাজমান একটা দুঃখবহ পরিস্থিতির দিকে ইংগিত করা হয়েছিল। এবং এর মধ্য দিয়ে ইসলামী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আধুনিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা কারও একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা শুধু চিন্তা-ভাবনামুক্ত ছাত্রদেরই খোশগল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটাকে এমনকি, সমাজের চিন্তাশীল ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরাও বিদ্রুপের সঙ্গেই নাকচ করে দেওয়াটাকে কোন কঠোর বা অভদ্রজনোচিত ব্যবহার বলে মনে করেন না।

খুব বেশী দিনের কথা নয়, আমি ফ্রাঙ্কফোর্টের একজন বিচারকের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছিলাম। আমি সেই জজ সাহেবকে জানতাম একজন খুব বিজ্ঞ, উদারমনা, শিষ্টাচারী ও সমঝদার ব্যক্তি হিসেবে। তিনিও, তাঁর, পত্রে, ইসলামের এই সীমিত একাধিক বিবাহ-প্রথার উপরে আপত্তি তলে ছিলেন এবং এ ব্যাপারে কঠিন বিদ্রুপ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন নি। অন্ততঃ, আমার তো তাই মনে হয়েছিল। এতে আমারও একবার মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে, তাঁকেও সেই 'চারপিতার' (Forefather =Four Father) কৌতুকটা দিয়েই জবাব দেওয়া যাক। কিন্তু, বিচক্ষণতা আমাকে তা থেকে বিরত রেখেছিল।

তাঁকে যে সংক্ষিপ্ত জবাব আমি দিয়েছিলাম, তাতে বলেছিলাম যে, প্রথমতঃ ইসলামের এই বিধানটি (Provision), যাতে একাধিক বিবাহের কথা বলা হয়েছে, তা কোন সার্বজনীন আদেশ নয়। এবং এটার অনুমতি দেয়া হয়েছে প্রয়োজনে সামাজিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য এবং নারীর অধিকার অক্ষুন্ন রাখার জন্য। পবিত্র কুরআন একটি যৌক্তিক গ্রন্থ। সুতরাং তা মুসলিমদেরকে অসম্ভব কিছু করার জন্য বলতে পারে না। আল্লাহ্‌র নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন প্রায় সমান সমান সংখ্যায়; এখানে সেখানে দু'চারজন কমবেশী থাকতে পারে মাত্র। ইসলামের মত একটি যুক্তিসম্মত বা র‍্যাশনাল ধর্ম, যাতে বার বার জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কথা ও আল্লাহ্‌র কাজের মধ্যে কোনও অসামঞ্জস্য নেই, তা কী করে এমন একটি আদেশ দিতে পারে যা অস্বাভাবিক ও অবাস্তব এবং যা কার্যকর করা হলে সমাজে দারুণভাবে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে, নানা দরূহ সমস্যার সৃষ্টি হবে? দরুন, ছোট একটি দেশ, যার দশ লক্ষ বিবাহযোগ্য পুরুষ আছে এবং প্রায় সমান সংখ্যক নারীও আছে। যদি সেখানে চার বিবাহের এই আদেশটিতে একটা আইন হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আড়াই লক্ষ পুরষ দশ লক্ষ নারীকে বিয়ে করে নিয়েছে এবং বাদবাকী সাড়ে সাত লক্ষ পুরুষের কারো ঘরে কোন বউ নেই।

অথচ দুনিয়া তাবৎ ধর্মে মধ্যে, একমাত্র ইসলামই প্রত্যেকটি নর ও নারীকে বিয়ে করার কথা জোর দিয়েই বলেছেন। পবিত্র কুরআনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে বলা হয়েছে স্বাভাবিক ভালবাসার সম্বন্ধ এবং একজনকে অপরজনের শান্তির উপায়।

'এবং সতী সাধ্বী মু'মিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কেতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে সতী-সাধ্বী নারী (তোমার জন্য বৈধ করা গেল) যখন তোমরা তাদেরকে তাদের দেন-মোহর দিয়ে দাও বিয়ের উদ্দেশ্যে, অবৈধ কামনা চারিতার্থে নয়, এবং গোপন প্রণয়নীরূপেও নয়...'। (আল মায়েদা- ৫:৬)

একইসঙ্গে কুরআন মজীদ কৌমার্য অবলম্বনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এটাকে একটা মানব সৃষ্ট প্রথা বলে ঘোষণা দিয়েছে (৫৭ঃ২৮)। কাউকে একলা বাকী দুনিয়াটা থেকে আলাদা রুদ্ধ করে রেখে কোন লাভ নেই, অথবা প্রাকৃতিক কামনা-বাসনাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার মাধ্যমে কাউকে শাস্তি দান করেও লাভ নেই। ইসলামে বিবাহ-প্রথা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। আমার হাতে এখন এত সময় নেই যে, আমি বিয়েতে বর ও কনে নির্বাচনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দিয়েও আলোচনা করি, বা তালাক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত আইনকানুন ও সমাধান নিয়ে কথা বলি।

'একাধিক বিবাহ'-এর কথাতেই ফিরে আসা যাক। কুরআন করীম পাঠে জানা যায় যে, যুদ্ধোত্তরকালীন বিশেষ পরিস্থিতির আলোকেই বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। যুদ্ধের পর দেখা যায় যে, সমাজে একটা বিরাট সংখ্যক ছেলেমেয়ে এতীম হয়ে গেছে এবং নারী ও পুরুষের সংখ্যাসাম্যে সমতা দারুণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মানীতে এই ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম যেহেতু জার্মানীর কোন প্রধান ধর্ম নয়, সেহেতু জার্মানী এই সমস্যার কোন সমাধান দিতে পারেনি। খৃষ্টধর্মের এক-বিবাহ প্রথার কঠোর শিক্ষা এর কোন সমাধান দিতে পারে না, পারেনি। সুতরাং জার্মানীকে সেদিন যুদ্ধের পরিণতিতে সামাজিক ভারসাম্যহীনতায় নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। সেখানে তখন, এত বিরাট সংখ্যক বয়স্ক অবিবাহিত নারী এবং যুবতী-বিধবা ছিল যে, তাদের বিয়ে শাদীর কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব হয়নি। বিশাল ইউরোপ মহাদেশে শুধু জার্মানীই যে একমাত্রএই বিরাট ও চরম বিপজ্জনক সামাজিক সমস্যাদির শিকারে পরিণত হয়েছিল, তা নয়। গোটা পাশ্চত্য সমাজের জন্যই তখন এই সমস্যাটা এত বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তার মোকাবেলা করাই সম্ভব ছিল না।পরিণামে, নৈতিক অধঃপতন এবং নরনারীর অবাধ মেলামেশার জোয়ারকে থামানো যায়নি, প্রতিহত করা যায় নি। যার দরুন, তা স্বাভাবিক কারণেই বিরাজমান ভারসাম্যহীনতাকে উত্তাল বেগে বৃদ্ধি করেছে, তার বিস্তার ঘটিয়েছে।

(চলবে)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান (সিদ্দীকী)
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

লাহোর শাহী কেল্লার জেলের ঘটনাবলী

যেদিন আমার হাইকোর্টে হাজির হবার কথা সেদিন ছোট অফিসার ডিএসপি সাহেব এর কাছে জানতে চাইলেন হাতকড়া পরাবে কিনা। প্রথমে ডিএসপি সাহেব বললেন হাতকড়া লাগাতে হবে না, প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরে ডি.এস.পি সাহেব আমাকে বললেন, Mr. Imdad! Don't mind please!! আইনত আপনাকে হাতকড়া পরাতেই হবে, আইনের শাসন মান্য করাই উত্তম। অতঃপর দুজন সশস্ত্র সিপাহীর সাথে আমাকে প্রস্তুত করা হল। সাধারণত এই সিপাহীরাই আসামিকে আদালতে নিয়ে যায়। গণপরিবহনে যেমন লোকাল বাসে করে যেতে হয়, ভিড়ের কারণে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে।

কিন্তু আমাকে ডি.এস.পি সাহেব নিজের জিপে বসালেন। তাঁর সাথে আরও অফিসার ছিলেন, একটি গাড়ি যথেষ্ট ছিল না। তাই আরেকটি গাড়ির বন্দোবস্ত করা হল। আর আমার সাথে দুজনের বদলে শুধু একজন সিপাহী রাখা হল। যখন আমরা শহরের ভেতর দিয়ে আদালতের দিকে যাচ্ছিলাম তখন কল্পনা করে অত্যন্ত খুশি হচ্ছিল যে,

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পর্কে কুরআনে আছে, হুযুর (সা.) এর ডানে বাঁয়ে ফেরেশতাগণের পাহারা থাকত। সময়ের পূর্বে হাইকোর্টে পৌঁছে গেলাম। হাইকোর্টে প্রবেশের পূর্বে হাতকড়া খুলে নেয়া হল। যথাসময়ে আদালতে জজ সাহেবের সামনে হাজির হলাম। জজ সাহেব কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না তবে গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন। তারপর আবার কারাগারে ফেরত আসলাম। মন ভাল হয়ে গেল যে, শীঘ্রই বেকসুর খালাস পাব, ইনশাল্লাহ্।

আমার ওস্তাদ মুকাররম নুরুল হক তানভীর সাহেব যখন এই অধমের সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন, ডিএসপি সাহেব তাঁর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় আমার প্রশংসা করেছিলেন। আমার ভাল করে মনে আছে, আমার পাশের কামরায় এক কয়েদী ছিল যার লম্বা লম্বা দাড়ি ছিল। সে রোজাও রাখত তবু তাকে জেলখানার লোকেরা অত্যন্ত গালাগালি করত। তারা আমার নামাযেরও প্রশংসা করেছিলেন। একবার আমি আসরের নামায পড়ছিলাম তখন হঠাৎ নামাযের মধ্যেই মনে হল বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ করছে। যখন নামাযের সালাম ফেরালাম তখন দেখলাম একজন অফিসার চেকিং এর জন্য এসেছেন। আমাকে নামায পড়তে দেখছিলেন। নামাযের পরে আমি শুনলাম তিনি বলছেন যে এই ছেলে যদি মুসলমান না হয় তো আর কে মুসলমান হবে!!

শুদ্ধভাবে, বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায পড়ার তৌফিক একমাত্র আল্লাহ তা'লার ফযল আর আহমদিয়াতের বরকতেই এই অধমের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা না হলে- আমি তো কিছুই না।

আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করি। লালিয়া থানা হাজত থেকে মুক্তির সময় দুজন মধ্যবয়সী কয়েদী যারা আমার সাথে মাত্র একটি রাত অতিবাহিত করেছিল, তাদের সাথে তেমন ভাল করে আলাপচারিতাও হয়নি। কিন্তু তারপরেও আল্লাহতা'লার ফযলে তারা আমার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে বিদায়ের সময়ে তাঁরা দুজন আমার সাথে কোলাকুলি করলেন আর অনেক পীড়াপীড়ি করে একজন টাকাও দিয়ে দিলেন। আমি টাকা নিতে চাচ্ছিলাম না, জোর করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা

প্রথম গ্রেফতারের পর সে রাত তো মোটামুটি অবচেতন ভাবেই কাটল। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে অসাধারণভাবে মনে শান্তি এসেছিল। সকালে উঠলাম তখন কুরআনের এই আয়াতটি মনের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল-

اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِيۡبَةٌ ۙ قَالُوۡۤا
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيۡهِ رٰجِعُوۡنَ

(সূরা বাকারা-১৫৭) এথেকে আমার মনে অত্যন্ত প্রশান্তি আসল যে আল্লাহতা'লা আমার সাথে আছেন। শাহী কেল্লায় প্রথম

দিনই আমার মনে একথা গেঁথে দেয়া হয়েছিল যে এখানে আমাকে ৩০ দিন থাকতে হবে। কিন্তু এমন খেয়ালও হত যে হয়ত কোন বড় রকমের বিপদও আসতে পারে। বন্দীদশার অধিকাংশ সময় দোয়ায় মশগুল থাকতাম। কয়েকবারই এমন মজার ব্যাপারও ঘটত যে আমি কুরআনের সেই দোয়া পড়তে থাকতাম যা পূর্বে আমার মুখস্ত ছিল না। সেসময়ে নিজের অজান্তে কিভাবে মনে আসত। যেমন একবার যখন আমি লালিয়া হাজত থেকে আদালতে যাবার সময় বাসে চড়েছিলাম, বাসে তো দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না। খুব কষ্ট হচ্ছিল কারণ হাতকড়া পড়া অবস্থায় বাসের রড ধরা কষ্টকর ছিল, বারবার ধাক্কা খাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ ঝিমুনি মত হল, যখন চেতনা আসল তখন লক্ষ্য করলাম আমি কুরআনের এই আয়াত পড়ছি–

رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

(বনী ইসরাঈল-৮১)

এছাড়া

رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ

(মুমিনুন-৩০) এই আয়াত। এটি জেলের বন্দীদশার স্মৃতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আনন্দদায়ক স্মৃতি।

লালিয়া থেকে ফেরত আসার পরেও অস্থির ছিলাম। অজানা আশঙ্কায় মন কেঁপে উঠত। ঘুমের মধ্যে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতাম। যখন প্রথম দিনই তারা আমাকে মারধর করে তখন খুবই কষ্ট হয়েছিল, তখন যদি আল্লাহ তা'লার রহমত বর্ষিত না হত তাহলে বোধহয় মাথার রগই ছিঁড়ে যেত। আমাকে যখন মারত তখন শুধু এটুকুই বুঝতে পারতাম যে আমাকে মারছে। শরীরের যেসব জায়গায় মারত, মারের সেসব জায়গায় বেশী কষ্ট হত না। কিন্তু মানসিকভাবে অসহ্যকর কষ্ট হত। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে একমাত্র আল্লাহতা'লা ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।

লাহোরে বেশীরভাগ সময় আমি কুরআনের আয়াত পাঠ করতে থাকতাম। আর কুরআনের আয়াত পাঠ করে যে আনন্দ হত তা ভাষায় বর্ণনা করার মত না। মাঝে মাঝে মাথায় যে আয়াত আসত তা থেকে আন্দাজ করতে চেষ্টা করতাম আজকে কী ঘটবে। যেদিন মুকাররম নুরুল হক তানভীর সাহেব আমার সাথে দেখা করতে আসলেন, গোড়ার দিকে আমার কোন ধারণা ছিল না যে তিনি আসবেন। তিনি আসার কয়েক ঘন্টা পূর্বেই আমার মনে এই আয়াত আসল–

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ

(সূরা আল কাসাস:৮৬)। মাথার মধ্যে এই আয়াতগুলো চেতনার/কল্পনার মত আসত। মুকাররম তানভীর সাহেবের সাথে সাক্ষাতের পরে এই আয়াতের বাস্তবতা আমার কাছে পরিষ্কার হল। আর এভাবেই এই আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত মজা পেলাম। আমাদের সর্বশক্তিমান খোদা অত্যন্ত ভালবাসা দানকারী আর কৃপালু ও দয়াশীল। জেলে থাকার সময় আমি তাঁর ভালবাসার ঝলক ভালোমত প্রত্যক্ষ করেছি। প্রতিটি সমস্যার পর আল্লাহতা'লা আমাকে সান্তনা দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার কেস এ কেউই আমার জন্য কিছু করতে পারবে না। আমার জানা ছিল না যে আমার মুক্তির জন্য হাইকোর্ট এ মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে লাহোর শাহী কেল্লায় আমার বেশী হলে ৩০ দিন থাকা হবে কিন্তু তার বেশী নয়। একটি স্বপ্নের কারনে এই বিশ্বাসের জন্মহয়েছিল। বাস্তবে এমনটিই হয়েছিল আর আমি ৩০ দিনের আগেই মুক্তি পেয়েছিলাম (আলহামদুলিল্লাহ)।

অতি সূক্ষ্ম রুহানী অভিজ্ঞতা

মঙ্গল বা বুধবারে ঠিক করলাম যে আসছে শুক্রবার জুম্মার দিনে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে একটি দোয়া অবশ্যই কবুল করাব। দোয়া এটি ছিল যে আগামী যেদিন আদালতে আমার মামলা পেশ হবে সেদিনই যেন আমার মুক্তি হয়। রাত দু'টার সময় দোয়া মাত্র শুরু করেছিলাম কিন্তু দোয়া করতে বাধা আসল। কিভাবে এমন হল তা বোঝা কষ্টকর ছিল কিন্তু যাহোক দোয়া করতে বাধা দেয়া হল। দোয়া করতে বাধা দেয়া হল মানে এই যে, হৃদয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কলেমা বা আয়াত মুখে আসছিল না। নামায পড়তে পারলাম না কেননা সুরা ফাতেহা বা কলেমা সমূহ মুখেই আসছিল না, মনেও আসছিল না। এজন্য নামাযই পড়া হল না। সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা কষ্টকর। আমি নিজেও কিছু বুঝলাম না কী হল। এজন্য তেমন আতঙ্কিতও হলাম না। কিন্তু মনের মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হল যে, না জানি এখন কী হবে? যাহোক সকাল পর্যন্ত অবস্থার পরিবর্তন হল না। সকাল নয়টার পরে সালাতে তাসবীহ পড়ার কথা মনে হল। সুতরাং আল্লাহতা'লার প্রশংসায় সালাতে তাসবীহ পড়ে সান্তনা পেলাম। আল্লাহতা'লা দোয়া থেকে বিরত রাখার কারণ আমাকে বোঝালেন যে–

১. তুমি তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চাও, ধৈর্য্য ধরতে চাও না। তুমি কী সেই খোদার উপর আস্থা রাখতে পারছ না, যে তোমাকে নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় এক সপ্তাহেরও বেশী এই কয়েদখানায় রেখেছে? তোমার খোদা কী তোমাকে বাঁচাননি? তিনি কী তোমাকে এখন পর্যন্ত নির্যাতনকারীদের থেকে বাঁচাননি! আর আগামীতেও বাঁচাতে পারবেন না? সেই খোদাই কী পুলিশকে এই ক্ষমতা দেয়নি যে তোমাকে বন্দী করে? যদি তিনি চাইতেন তাহলে কী তোমাকে পুলিশ থেকে বাঁচাতে পারতেন না? এটি সম্ভব যে এই জেলে তোমার আরও কিছুদিন থাকার মধ্যেই তোমার কল্যাণ নিহিত আছে। তুমি কী খোদার বিচারে রাজি নও?

২. তোমাকে খোদাতা'লার তকদীরে (নিয়তিতে) রাজি থাকতে হবে। তুমি তোমার মত করে খোদাতা'লাকে রাজি করাতে পারবে না। সুতরাং তুমি তোমার খোদার সিদ্ধান্তে রাজি হও, এর মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।

এরপর আমি প্রশান্তি লাভ করলাম আর আমার মধ্যে পরিতৃপ্তিও আসল যে আমার খোদা আমার সাথেই আছেন তো আমার চিন্তা করার কী আছে। এরপর আমি

খোদার কাছে এই দুটি বিষয়ের আলোকেই দোয়া করতে থাকলাম আর অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ করলাম। মাঝে মাঝে তো আমি এই দোয়াও করেছি যে, 'হে খোদা তোমার যতদিন ইচ্ছা আমাকে এই বন্দীদশায় রাখ আর যা খুশি ব্যবহার কর আমার সাথে। আমার কোন অভিযোগ থাকবে না। আমি তোমার সিদ্ধান্তেই খুশি থাকব।' আর আমি এই দোয়াও করতাম–

হো ফাযল তেরা ইয়া রাব্ব ইয়া কোই ইবতেলা হো
রাযি হ্যায় হাম উসিমে জিসমে তেরি রেযা হো

হোক না তোমার অনুগ্রহ বা কোন পরীক্ষা, হে আমার প্রভু!
তাতেই আমি সন্তুষ্ট যদি তুমি সন্তুষ্ট থাকো।

কিন্তু এরপর আরেকটি বিষয় আমার মাঝে দেখা দিল। সম্ভবত ১৩ বা ১৪ই নভেম্বর হাইকোর্টে আমার কেসের শুনানীর দিন ধার্য ছিল।

কিন্তু এর ফলাফল সম্বন্ধে আমার কোন ধারনা ছিল না। একদিন আমার মধ্যে অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। তাই আমার আল্লাহর কাছে এই দোয়া করলাম যে, হে আমার আল্লাহ! আমি বুঝেছি যে তোমার তকদীরই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি তোমার তকদীরের শিকলে আবদ্ধ। আর কেয়ামত পর্যন্ত তোমার তকদীরে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। কিন্তু হে আমার প্রিয় প্রভু তুমি আমার একটি ইচ্ছা পূরণ করে দাও, তোমার জন্য তো এমনটি করা কোন কঠিন বিষয় নয়। তোমার প্রিয় রসূল (সা.) বলেছিলেন, **"লা ইউরাদ্দুল কাযা ইল্লাদ দোয়া- দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সিদ্ধান্ত (তকদীর) পরিবর্তন হতে পারে"**। আজকে তুমি আমার একটি দোয়া কবুল করে আর তোমার তকদীর আমার জন্য পরিবর্তন করে রসূলের এই হাদীস এর সত্যতা আমাকে প্রমাণ করে দেখাও। তুমি আমাকে একটি স্বপ্নের মাধ্যমে বুঝিয়েছিলে যে আমাকে এখানে ৩০ দিনের বেশী থাকতে হবে না। যদি ৩০ দিন থাকতে হয় আর তারপর মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে কয়েকদিন আরও কম করে দাও।

কারন জামেয়াতে বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ও ডিনারের দিন আছে। হুযুর (আই.) আসবেন আর হুযুরের সাথে বেশ কিছু গ্রুপ ছবি তোলা হবে। তিনটি গ্রুপ ছবিতে আমারও শামিল হবার কথা। যদি আমি ৩০ দিন পরে মুক্তি পাই তাহলে এই কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে আর আমি এর থেকে বঞ্চিত থেকে যাব। শুধুমাত্র যদি আমি কিছুদিন পূর্বেই মুক্তি পেয়ে যাই তাহলে এই চমৎকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারব। আর এভাবেই খোদা তোমার ভালবাসা প্রদর্শনের রূপ দেখতে পাব। তুমি ক্বাদির খোদা তোমার তকদীরের বিজয় হবে। তুমি তোমার মহত্ব দেখাও।'

এটিও একটি বৃহস্পতিবারের দিবাগত রাতের দোয়া ছিল। মহাপ্রতাপশালী খোদা তার বান্দার উপর অনেক সদয় আর দয়ালু। আমার এই দোয়া কবুল করলেন। ১৮ই নভেম্বর আমার কেস আদালতে পেশ হল আর আমাকে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হল (আলহামদুলিল্লাহ)। সুবহানাল্লাহ! আসলেই সেই খোদা অসীম দয়ালু খোদা, আর তিনি নিজ বান্দাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন, কেউ যখন তার কাছে দোয়া করে তা সে যেভাবেই হোক তিনি সেই দোয়া শুনেন আর কখনই তিনি তার বান্দাকে খালি হাতে ফেরান না। আল্লাহ তার ধনভান্ডার বিলিয়ে দিতে চান যদি কেউ তার কছে চায়। সত্যিকার অর্থে তার শুকরিয়া আদায় করার মত ভাষাই আমার কাছে নেই।

কিস তারাহ তেরা কারুঁ এ্যায় যুলমিনান শুকরো সিপাস
উও যুবাঁ লাউ কাহাঁ সে জিস সে হো ইয়ে কারওয়ার

কিভাবে আমি তোমার প্রশংসা করব হে দয়াময়
কোথা থেকে সেই উপযুক্ত শব্দমালা আনব যা তোমার গুণকীর্তন করতে পারে

রাবওয়া আসার পর প্রায়ই এই খেয়াল হত যে কষ্ট অনেক কম হয়েছে সেই তুলনায় খোদার ভালবাসা অনেক বেশী পেয়েছি যা বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়।

(চলবে)

সমাদর

শরীফ আফ্রাদ

অপরূপ সৃষ্টি প্রভুর
মানুষ কয় তারে,
জগৎ নত তারি কাছে হায়!
কৃষ্টি সরোবরে।
ধনে ধনী সাজ সজ্জায়
জ্ঞানে সঙ্গীবাদী,
পাপ-পুণ্যে নয়তো দামী
দেখিলেন শেখসাদী।
আপন বিধিরে তুচ্ছ করি
মাতি সবে কোন ভালে,
লাখো প্রণাম, তুচ্ছ বুলি
সাধে, যাবে যে তারে
স্রষ্টার ধন করিয়া বেষন
কে বা' যবে, দেব কারে,
হস্তলগ্নে পড়িয়া কাতর
ভিখারী অনাহারে।
সাধে পুষিলেন বৃক্ষরাজি
দিবে সে ফল,
রং মাখিয়া ছুটিয়া বেড়ায়
করিয়া নব ছল।
নাঙ্গা দেহে জন্ম লইয়া
বাঁধিছে স্বর্গে ঘর,
কেউবা পেটে পাথর বাঁধিয়া
রাত জাগে অবিচল
হীন বলে করি তারে
বড়ই অনাদর
আছে যার ঢের, তারে
করি সমাদর ॥

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৭০)

এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো: কোন কলেমা-পাঠকারীকে কাফের বললে সেই ফতোয়াদানকারীর পরিণতি কি হবে?

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তকাবলী এবং প্রকাশিত পত্রিকা থেকে সংকলিত উপরোক্ত তিনটি দৃষ্টান্তমূলক উদ্ধৃতি কি একজন আহমদী মুসলমানের আকিদা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়? দ্বিতীয়তঃ এরূপ আকিদা সত্ত্বেও কোন কোন ফতোয়াবাজী কট্টরপন্থী এবং কুপ-মণ্ডুক আলেম মন-গড়া সংগা প্রদান করতঃ একজন কলেমা তৈয়্যব পাঠকারী আহমদীকে অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করলে তাঁর অবস্থান এবং পরিণতি কি হবে? নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তমূলক উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

* সূরা আন নিসা (৯৪ আয়াত): "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে মুসলমানদের ন্যায় 'আসসালামু-আলাইকুম' বলে, তাকে 'তুমি মু'মিন নও' একথা বলার অধিকার তোমার নেই।"

* "মু'মিনদের মধ্যে প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রসূলের প্রতি।" (আল বাকারা: ২৮৬ আয়াতাংশ)

* "আর যারা (মুমেনরা) পরকালে ঈমান রাখে, তারা (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে এবং তারা সর্বদা তাদের নামাজের সুরক্ষা করে।" (আল আনাম: ৯৩)

* বুখারী শরীফের হাদীসে আছে: "যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয়ে নামায পড়ে এবং আমাদের যবাই করা পশুর গোশত খায়, সে মুসলমান। তার সম্বন্ধে আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল যামানত দিয়েছেন; সুতরাং তোমরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যামানত বিনষ্ট করিও না।" (বুখারী)

* অন্য একটি হাদীসে আছেঃ "একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহব্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

* হযরত জিব্রীল (আ.) মানুষের বেশে আঁ হযরত (সা.)-এর দরবারে আসলেন এবং হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: "হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সা.) বললেন: ইসলাম হলো এই যে, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল আর তুমি নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রমাযানের রোযা রাখ এবং পথের সঙ্গতি থাকলে তুমি বায়াতুল্লাহর হজ্জ পালন কর। সে ব্যক্তি বলল, হুযুর যথার্থই বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, আমরা তার ব্যাপারে অবাক হলাম যে, সে প্রশ্নও করে, আবার উত্তরের সত্যায়নও করে । তারপর সে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত করুন। হুযুর (সা.) বললেন, ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহতে ঈমান আন, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং রসূলগণের উপর ঈমান আন, তাছাড়া পরকালে ঈমান আন এবং কাযা ও কদর সম্পৃক্ত ভাল ও মন্দের উপরও ঈমান আন। সে ব্যক্তি বলল যে, আপনি সঠিক বলেছেন।" (মুসলিম: কিতাবুল ঈমান)

নোট: হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর অভিমত: যুগে যুগে এক শ্রেণীর মোল্লাদের মুখে 'ইসলাম বিপন্ন'– এই শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে এবং শান্তিবাদী

ইসলামকে তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। এরূপ ঘটনাবলীর শিকার হয়েছেন অনেক বুযুর্গানে দ্বীন এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি স্বয়ং মোল্লা শ্রেণীর কতিপয়ের বিরাগভাজন হয়ে 'কুফরী ফতোয়ার' শিকার হন এবং পরবর্তীতে কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান বুযুর্গ স্বয়ং যে নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, তা খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেন: "কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ইমানের আওতা থেকে বহিস্কার করা যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই সেই কলেমাকে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা না করে, যার দ্বারা সে ঈমান এনেছিল" (কিতাব মঈনুল হুক্কাম পৃ. ২০২)।

* অন্য একটি হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বিষয়টি গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য উদাত্ত আহব্বান জানাচ্ছি। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফের ফতোয়া দেয়, সে নিজে কুফরী করে (মুসলিম শরীফ কিতাবুল ঈমান)। অতএব তথাকথিত উগ্রপন্থী ফতোয়াবাজদের আধ্যাত্মিক মানদন্ডের প্রেক্ষিতে প্রকৃত অবস্থান কি তা সর্বাগ্নে নিরূপন করা অত্যাবশ্যক নয় কি?

প্রাসঙ্গিকভাবে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ধর্মীয় বিষয়ে মত-পার্থক্যের কারণে শক্তি প্রয়োগ নীতিকে ইসলাম সমর্থন করে কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে পবিত্র কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে নৈতিক শিক্ষামূলক ঘটনার উল্লেখ করছি যাতে উগ্রপন্থী আলেমদের আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব মূলোৎপাটিত হতে পারে। বর্তমান যুগে মুসলমানগণ বহু দল ও উপদলে বিভক্ত এবং তারা পরস্পর ফতোয়াবাজীতে তৎপর। এরূপ অবস্থায় শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে যুক্তি-তর্কের পরিবর্তে জোর-জবরদস্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

* "ধর্মের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ এবং এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, সৎপথ এবং ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে (২:২৫৭)। এই আয়াতে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলাম এমন প্রকাশ্য সত্য যে শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজনই নেই। উপদেশ দানের ক্ষেত্রে দলিল-প্রমাণ, যুক্তি, জ্ঞান ও নিদর্শনের উপর ইসলাম জোর দিয়েছে। ধর্মের ব্যাপারে দমন-নীতি বা শক্তি-প্রয়োগের অধিকার কাউকে দেয়া হয় নাই।

* পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মীয় মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী একমাত্র খোদাত'লা স্বয়ং। তাই বলা হয়েছে: "আল্লাহ তাহাদের (পরস্পর বিরোধীদের) মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করিবেন সেই বিষয় সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা মতানৈক্য পোষণ করিয়াছে।" (সূরা বাকারা: ১৪ তম রুকু)।

* "বলো: ইহা তোমাদের রব্বের নিকট হইতে সমাগত সত্য। সুতরাং, যাহার ইচ্ছা সে ইহাতে বিশ্বাস আনুক এবং যাহার ইচ্ছা, সে অবিশ্বাস করুক" (সূরা কাহফ: ৪র্থ রুকু)।

* "সুতরাং উপদেশ দাও, কারণ, তুমি একজন উপদেশ-দানকারী মাত্র। তোমাকে তাহাদের ওপর রক্ষী হিসাবে মনোনীত করা হয় নাই।" (সূরা গাশিয়া, ১ম রুকু)।

* "তাহার চাইতে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদে আল্লাহর নামের যিকির করিতে বাধা প্রদান করে এবং সেইগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে?" (সূরা বাকারা, ১৪তম রুকু)।

পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর আলোকে এ–কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয়-বিশ্বাস, তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পূর্ণ-স্বাধীনতা রয়েছে, জোর-জবরদস্তি বা অত্যাচার-নীতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং অবান্তর।

* কোন মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে একমাত্র খোদা তা'লাই সঠিকভাবে জানেন। এক যুদ্ধে হযরত ইসামা বিন যায়েদ (রা.) এক শত্রুকে হত্যা করেন, যদিও সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে 'কলেমা তৈয়ব' উচ্চারণ করেছিল। এই ঘটনার কথা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পৌঁছালো, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশা করলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বললেন:

"হে রাসুলুল্লাহ, ঐ ব্যক্তি তো মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। হযরত রাসূল করীম (সা.) বললেন: "আলা শাকাকতা আন কালবিহি।" অর্থ: "তুমি কি তার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে?" (মসনদ ইমাম আহমদ)

এই হাদীস হতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, কোন মানুষ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দান করে অর্থাৎ কলেমা পাঠ করে, তবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার অধিকার রাখে না। সেই অধিকারের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং। আহমদীয়া মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্র কলেমা পাঠকারী মুসলমান এবং সেজন্য তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে জবাবদিহি করতে সদা-সর্বদা প্রস্তুত।

অপপ্রচারকারীদের প্রতি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ

কলেমা পাঠকারী আহমদীয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদের কাছে এই মর্মে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করছি যে, তারা কলেমা পাঠকারীকে অমুসলমান বলার অধিকার রাখে কী? পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উপরোক্ত রেফারেন্সসমূহ এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর লেখা থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতির আলোকে অপপ্রচারকারীগণ জবাব দিতে পারবেন কি?

[চলবে]

প্রাচীন ভারতে আবির্ভূত নবীদের সন্ধানে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র নবী ছিলেন কি?

ইসলাম এক সার্বজনীন ধর্ম। এটাই একমাত্র ধর্ম যা সব নবীকে গোড়াতে বা সূচনাতে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়। আর সব নবীকে মান্য করার শিক্ষা দেয়, তাদের সত্যতার ঘোষণা দেয়। ইসলাম বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব জাতিকে এক করার জন্য এসেছে। আর এই একতাবদ্ধ করার একটি মৌলিক কাঠামো হিসেবে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে- সব জাতিতে নবী-রসুল এসেছেন। তাই ইসলামের পদচারণাকারী মুসলমানদের খুঁজে দেখা উচিত ভারতবর্ষে কোন নবী-রসুল এসেছেন কিনা? এ প্রসঙ্গে আজ থেকে প্রায় একশ' পচিঁশ বছর পূর্বে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "একবার মহানবী (সা.)-কে অন্যান্য দেশে আগমনকারী নবীদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি (সা.) তখন এটা বললেন, প্রত্যেক দেশে আল্লাহ্ তা'লার নবী এসেছেন। আর বলেছেন–

كان في الهند نبيا اسود اللون اسمه كاهنا

অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক নবী আগমন করেছেন। যিনি কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন। তাঁর নাম কাহেন ছিল। অর্থাৎ কানাইয়্যা যাঁকে কৃষ্ণ বলা হয়।" (চশমায়ে মারেফাত, পৃ- ২৮২-৮৩, রূহানী খাযায়েন, খন্ড- ২৩)

তিনি হযরত কৃষ্ণকে নবী বলায় অনেকে তাঁর বিষয়ে আপত্তি করেন, এটা কিভাবে হতে পারে! অনেকে হাদীসটি নিয়েও আপত্তি করে থাকেন। তবে তাঁর উপর এককভাবে আপত্তি করা হলেও তিনি শুধু একা নন আরো অনেক মুসলিম মনিষী তদ্রুপই বলেছেন। কুরআন হাদীসও বিষয়টি সমর্থন করে। এ কারণে এ প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস, বুযুর্গানে উম্মত ও আলেম-উলামাদের দৃষ্টিভঙ্গিও উপস্থাপন করে বিষয়টি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'লা যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেই থেকে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নবী প্রেরণের ধারা অব্যাহত রেখেছেন। যেভাবে মানুষ জাগতিকভাবে উন্নতির পর উন্নতি করছে সেভাবে খোদা তা'লাও তাদের বুদ্ধিমত্তা ও মেধার সাথে তাল মিলিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নতুন নতুন শিক্ষা দিয়ে নবীদের পাঠিয়েছেন। এ কারণে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষা ও সীমারেখায় বিভিন্ন নবীদের নাম পাওয়া যায়। তারা সবাই আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে এক সত্য ও সঠিক শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। এক কথায় প্রত্যেক জাতির মাঝে রসুল এসেছেন। কোন জাতি নবী রসুল লাভের এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত নয়।

জগতে এমন কোন স্থান অঞ্চল নেই, যেখানে কোন না কোন নবীর আগমনের শুভ-সংবাদ বিদ্যমান নেই। এটা হতে পারে দূর-দূরান্তের এলাকাতে আগমনের কারণে তাদের সংবাদ অন্য এলাকায় পৌঁছায় নি। এটাও হতে পারে বহু কাল পূর্বে আগমনের কারণে এ যুগে সঠিকভাবে তাদের ইতিহাস সংরক্ষিত হয়নি। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত অবস্থায় হলেও তাদের প্রদত্ত সত্য শিক্ষার অপভ্রংশ অবশ্যই আজও বিদ্যমান রয়ে গেছে।

এমনিভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও তাদের নবীদের বর্ণনা পাওয়া যায়। যাদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও গৌতমবুদ্ধের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "এভাবে খোদা তা'লা যে বুযুর্গদের মাধ্যমে পবিত্র হেদায়াত (পথ নির্দেশনা) ভারতবর্ষে অবতীর্ণ করেছেন, আর তাঁদের পরে আগমনকারী যাঁরা হিন্দুদের সম্মানিত বুযুর্গ ছিলেন যেমন রাম চন্দ্র, কৃষ্ণ এঁরা সবাই সম্মানিত ও পবিত্র মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁরাও তাঁদেরই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন যাঁদের উপর খোদা অনুগ্রহ করেছেন।" (চশমায়ে মারেফাত, পৃ- ২৮২-৮৩, রূহানী খাযায়েন, খন্ড- ২৩)

শ্রীকৃষ্ণ এমন এক ব্যক্তিত্ব যার শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা, ধার্মিকতা ও সাধুতা সর্বজন স্বীকৃত। হিন্দুদের কাছে তাঁর এক সর্বোচ্চ আসন রয়েছে। এজন্য হিন্দুদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়। অধীর আগ্রহে তাঁর আগমনের অপেক্ষাও করা হচ্ছে। তাই, এক সত্য উদঘাটনের নিমিত্তে ইসলামের দৃষ্টিতে কি তাঁর পদ-মর্যাদা, বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য

পবিত্র কুরআনে একটি সার্বজনীন শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলো প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী-রসুল প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা বলছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ

অনুবাদ : আর নিশ্চয়, আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসুল পাঠিয়েছিলাম। (এই শিক্ষা দিয়ে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শয়তান থেকে বেঁচে চল। (সূরা নাহল : ৩৬)

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অনুবাদ : আর এমন কোন জাতি নাই যার নিকট কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। (সূরা ফাতের: ২৪)

وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অনুবাদ : আর প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছে হেদায়তদাতা। (সূরা রাদ: ৭)

প্রত্যেক জাতি-গোষ্টির মাঝেই নবী রসুল এসেছেন। তাহলে একবার চিন্তা করুন তাদের সংখ্যা কত দাড়াঁয়। পবিত্র কুরআনে স্ব-নামে মাত্র ২৫জন নবীর উল্লেখ রয়েছে। (তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫২-৫৩, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর) অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন– "আল্লাহ তা'লা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসুল পাঠিয়েছেন।" আবু জার গিফারী (রা) বর্ণিত,

قلت : يا رسول الله كم الانبياء ؟
قال مائة الف و اربعة و عشرون الفا

তিনি বলেন রসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহর রসূল নবী কত জন? তিনি (সা.) বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। (মিশকাতে মাসাবী, খন্ড-দ্বিতীয়, পৃ-৫১১, প্রকাশ কানপুর। তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই; আবু হাতিম(রহ.) আল আনওয়া ওয়াত্তাফাসীম- গ্রন্থে, তথ্যসূত্র: তফসীর ইবনে কাসির, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৩-৫৬, সূরা নিসার ১৬৫ আয়াতের তফসীর) তাহলে নবীদের একটা বিরাট সংখ্যা রয়েছে যাঁদের নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলছেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۖ

অনুবাদঃ আমরা তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করেছি এবং কারো কারো ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। (সূরা মু'মিন : ৭৮)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ

অনুবাদ : আর আমরা প্রেরণ করেছি এমন অনেক রসূল যাদের বৃত্তান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করেছি। আর এমন অনেক রসূল আছে যাদের বৃত্তান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। (সূরা নিসা: ১৬৪)

মোটকথা, উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে এটা সাব্যস্ত হয় যে, নাম বর্ণিত হোক অথবা না হোক প্রত্যেক জাতির মাঝেই নবী রসুল এসেছেন। এটা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহ পাকের ঘোষণা। কোন জাতিই রসূল থেকে বঞ্চিত নয়। তাহলে এই যে ভারতবর্ষ, যেখানে শত শত জাতিগোষ্ঠির হাজার হাজার বছর ধরে বসবাস, তারা কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? তাদের মধ্যেও অবশ্যই নবী রসূলরা এসেছেন। অবশ্যই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'লার এ ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে, বাস্তবায়িত হওয়াটাই অবধারিত সত্য।

এ কারণে আল্লামা মুফতি কিফায়াতুল্লাহ তাঁর পুস্তক 'তালীমুল ইসলাম'-এর ১১৬ পৃষ্ঠায় বলেন, 'এই আয়াতগুলো থেকে নি:সন্দেহে এটা প্রমাণ হয় প্রত্যেক জাতির জন্য খোদা তা'লা কোন না কোন হেদায়তদাতা ও সতর্ককারী পাঠিয়েছেন। আর এজন্য হতে পারে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানেও কোন নবী এসেছেন।'

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এ বিষয়টাই জোরালোভাবে নির্দিষ্ট করে বলেছেন, "প্রত্যেক জাতির মাঝে সতর্ককারী এসেছেন যেটা কুরআন থেকে প্রমাণিত। এজন্য রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ প্রমুখগণ স্ব-স্ব যুগের নবী ছিলেন।" (মালফুযাত, খন্ড- ৩, পৃ- ১৪২)

মহানবী (স.)-এর বাণী

এবারে আমরা হাদীস শরীফের আলোকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই। এ বিষয়ে আমাদের প্রিয়নবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স.) কি বলেছেন? আল হাফেয শেরওয়াহ বিন শেহদার দেহলমী ৫০০হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ও মুয়াররেক (ঐতিহাসিক) ছিলেন। ফেরদৌসুল আখবার ও তারীখে হামযান তাঁর দু'টি বিখ্যাত পুস্তক। তিনি তাঁর পুস্তক 'তারীখে হামযান' এর বাবুল কাফ-এ উল্লেখ করেন, রসূল (সা.) বলেছেন–

كان في الهند نبيا اسود اللون اسمه كاهنا

অনুবাদ: ভারতে কৃষ্ণ বর্ণের একজন নবী ছিলেন, যাঁর নাম ছিল কানাই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআনের পাশাপাশি দেহলমীর 'তারীখে হামযান'-এর উপরোক্ত হাদীসটি তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করে ঘোষণা দিয়েছেন হযরত শ্রীকৃষ্ণ নবী ছিলেন । আর এটা আমাদের প্রিয়নবী (সা.) বলে গেছেন। আমরা নিম্নে এর সমর্থনে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য কিছু প্রসিদ্ধ হাদীস উপস্থাপন করছি।

তিবরানীতাঁর তফসীর ও উসুলের পুস্তক 'আল মুজেমুল আওসাত' এ লিখেন–

و عن علی رضی الله عنه: ان الله تعالی بعث نبیا اسود فهو ممن لم تذکر قصته فی القرآن

অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা কৃষ্ণ বর্ণের একজন নবী পাঠিয়েছিলেন, যাঁর উল্লেখ কুরআনে নেই।

আল্লামা জামাখশরী লিখেন,

و عن علی رضی الله عنه: ان الله تعالی بعث نبیا اسود فهو ممن لم یقصص علیه

(তাফসীরুল কাশাফ , সূরা আল মুমেন, তফসীর আয়াত ওয়ালাকাদ আরসালনা..)

অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) বর্ণিত,

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা কৃষ্ণ বর্ণের একজন নবী পাঠিয়েছিলেন, যাঁর বিষয় তাঁর (সা.) কাছে বর্ণনা করা হয়নি।

এছাড়া তাফসীরে নাসাফী ও তাফসীর রুহুল বায়ানেও উপরোক্ত হাদীস রয়েছে।

এই হাদীসগুলোতে যে কালো বর্নের নবীর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ভারতবর্ষের হযরত শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। এ বিষয়ে কাজী আব্দুন নবী বিন আব্দুর রসুল আহমদনগরী (তাঁর মৃত্যু ১২শ হিজরীতে। অর্থাৎ এই বুযুর্গ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একশ' বছরেরও পূর্বের লোক ছিলেন) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'দাসতুর উলামা, জামেউল উলুম ফি ইসতেলাহাতিল ফুনুন'-এ লিখেন–

و اعلم ان رجلا كان فى الهند اسمه كان وله
اسماء شتى عند البراهمة كالكشن و غير ذالك
وولادته فى متهرا و نشوئه و نماؤه فى (كوكل)
و كل منهما اسمه معموره فى الهند بينهما و بين
الدهلى مسافة اربعين فرسخا. قيل انه كان
صاحب الاستدراج والكفار يعتقدونه و يذكرون
له خوارق العادات و كان اسود اللون سوادا
شديدا. قيل انه كان نبيا و تمسكوا فى ذالک بما
فى تفسير المدارک فى تفسير قوله تعالى :(مِنْهُم
مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ). و عن
على رضى الله تعالى عنه بعث الله نبيا اسود
فهو لم يذكر قصته فى القرآن.

অনুবাদ: জেনে রেখ, হিন্দুস্তানে 'কানা' (কানাই) নামক একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁকে অনেকগুলো নামে আখ্যায়িত করা হয়। হিন্দুদের কাছে তিনি কালকৃষন বা অন্যান্য নামে পরিচিত। তাঁর জন্ম হয়েছিল মথুরায়। তাঁর লালনপালন ও বেড়ে ওঠা গোকুলে আর এই উভয় নামই হিন্দুস্তানে অনেক প্রসিদ্ধ। এই উভয় বসতি আর দিল্লির মাঝে দূরত্ব ৪০ ফারসাখ (এক পারসাখের দূরত্ব ৩ মাইলের চেয়ে কিছুটা বেশী) দূরত্ব বিদ্যমান। নিশ্চয়ই তিনি উচ্চতর যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আর অস্বীকারকারীরা তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখে। আর তাঁর অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। তিনি গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের ছিলেন। আর বলা হয় তিনি নবী ছিলেন। তারা এ বিষয়ে তাই বলে থাকেন যা তফসীর মাদারিকে আল্লাহর বাণী–

مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তালা একজন কৃষ্ণ বর্ণের নবী আবির্ভূত করেছিলেন। তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারঁ উল্লেখ কুরআনে করা হয়নি। (দাসতুর উলামা, জামেউল উলুম ফি ইসতেলাহাতিল ফুনুন, খন্ড-৩, বাব আলকাফ,পৃষ্ঠা-৮১)

ভারতবর্ষের ওলী আওলিয়া, বিদগ্ধ পন্ডিত ও আলেমদের বক্তব্য

ভারতবর্ষের ওলী আওলিয়া, বিদগ্ধ পন্ডিত ও আলেমরাও শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র নবী বলে উল্লেখ করে গেছেন।

মুজাদ্দেদ আলফে সানী(রহ.) স্বপ্নে ভারতে কিছু নবীর কবর দেখেছেন। তাঁর মকতুবাতে উল্লেখ রয়েছে–

"পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে লক্ষ্য করিলে অতি অল্প স্থান দেখা যায়, যে- তথায় পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই; এমন কি ভারতবর্ষ, যাহা, এই ব্যাপার হইতে বহু দূরে বলিয়া মনে হয়; তথায়ও দেখিতেছি যে, ভারতেও পয়গম্বরগণ প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাহারাও সৃষ্টিকর্তার দিকে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতের কোন কোন নগরে পয়গম্বর (আ.)-গণের নূর- শির্‌কের তমরাশির মধ্যেও প্রদীপ্ত প্রদীপ সমূহের ন্যায় সমুজ্জ্বল বলিয়া অনুভূত হইতেছে। ইচ্ছা করিলে ভারতের সেই নগরগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেও পারি।" (মকতুবাত, প্রথম খন্ড, ৩য় ভাগ, পৃ-৩, মকতুব নম্বর-১৫৯, প্রকাশক আফতাবীয়া খানকাহ্‌ শরীফ, সাভার, ঢাকা। সন- ১৯৭৬)

দেওবন্ধ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ কাশেম নানতুবী (রহ.) বলেন,

باقی رہا دین ہندو اسکی نسبت اگر چہ ہم یقینا نہیں
کہہ سکتے کہ اصل سے یہ دین بھی آسمانی ہے
مگر یقینا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل
سے جعلی ہےخدا کی طرف سے نہیں آیا کیونکہ
اول تو قرآن شریف میں یہ ارشاد ہے - وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا
خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ - جسکے یہ معنی ہیں کہ کوئی امت
یعنی گروہ عظیم ایسی نہیں جسمیں کوئی ڈرانیوالا
نہ گزرا ہو پھر کیونکر کہدیجے کہ اس ولایت
ہندوستان میں جو ایک عریض وطویل ولایت ہے
کوئی ہادی نہ پہنچا ہو کیا عجب ہےکہ جسکو ہندو
صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا
ولی یعنی نائب نبی ہوں۔ دوسرے قرآن شریف میں
یہ بھی ارشاد ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۔ جسکا حاصل
یہ ہے کہ بعض انبیاء کا قصہ تو ہم نے تجھ سے
بیان کردیا ہے اور بعضوں کا قصہ بیان نہیں کیا
سو کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی انہیں
نبیوں میں سے ہوں جنکا تذکرہ آپ نہیں کیا گیا۔

মুবাহাসা শাজাহানপুর ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-"হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আমরা যদিও নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না নীতিগতভাবে এটা ঐশী ধর্ম, তথাপি নিশ্চিতভাবে এটা বলা যাবে না যে, এটা নীতি বর্হিভূত ধর্ম, খোদার পক্ষ থেকে আসেনি। কেননা প্রথমত কুরআন শরীফে এ ইঙ্গিত রয়েছে–

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

যার এই অর্থ কোন উম্মত বা বড় গোত্র এমন নেই যাদের মাঝে কোন নবী আসেনি। এরপর কিভাবে বলা যেতে পারে এই ভারতবর্ষ যেটা এক বিশাল দেশ তাতে কোন পথপ্রর্দশক প্রেরিত হয়নি। অবাক হওয়ার বিষয় নয়, যাঁকে হিন্দুরা অবতার বলে তাঁরা তাঁদের যুগের নবী অথবা ওলী অর্থাৎ নায়েবে নবী ছিলেন। দ্বিতীয়ত কুরআনে এ ঘোষণা রয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن
قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

যার সারকথা হলো, অনেক নবীর কাহিনী আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি আর অনেকের কাহিনী বর্ণনা করিনি। তাই এটা অবাক হওয়ার বিষয় নয়, ভারতবর্ষের নবীরা ঐসব নবীদেরই অর্ন্তভুক্ত যাদের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করা হয়নি।" মুবাহাসা শাজাহানপুর, ৩১ পৃষ্ঠা দেখুন, তিনি এতে হিন্দুদের অবতারদের নবী বলেছেন। অবতার কারা ছিলেন ? শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রমুখ মহামানবরাই তো!

হযরত মির্যা মাযহার জানজানা

তাঁর মলফুযাতে কৃষ্ণ ও রামকে নবী বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মকতুবাতে উল্লেখ করা হয়েছে- "মির্যা সাহেব এ বিশ্বাস রাখতেন, হিন্দুধর্ম খোদা তা'লার প্রেরিত ধর্ম, যা ইসলাম ধর্ম আত্মপ্রকাশের পর রহিত হয়েছে। রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ জী প্রমুখকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা উচিত। কেননা হতে পারে তাঁরা খোদার প্রেরিত ওলী অথবা পয়গম্বর ছিলেন।" (মকতুবাত, মির্যা মাযহার জানজানান শহীদ, অনুবাদ ও সংকলন- খালিক আনজুম, পৃষ্ঠা-৮৫)

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভী

"হিন্দুদের অবতারগণ সুস্পষ্ট হকের (সত্যের) বিকাশস্থল ছিলেন। তারা মানুষের মধ্য থেকে হোন অথবা সিংহ-মাছের মধ্য থেকেই হোন । যেভাবে আমাদের প্রাচীন শরীয়তে মূসা(আ.)এর লাঠি ছিল। হযরত সালেহ(আ.)এর উটনী ছিল। কিন্তু হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষ মোটা বুদ্ধির কারণে প্রকাশ ও প্রকাশস্থলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে নি। ফলে সবাইকে তারা উপাস্য বানিয়ে নেয়। আর পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।" (ফতোয়ায়ে আজিজী, পৃষ্ঠা-৩২৬)

খাজা গোলাম ফরিদ তাঁর মলফূযাত এ বলেন,

"এর পর কোন একজন প্রশ্ন করলো, শ্রী রাম চন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণ ফকির ও দরবেশ ছিলেন কি না? তিনি বললেন, সমস্ত অবতার ও ঋষিরা তাঁদের যুগের পয়গম্বর ও নবী ছিলেন। আর তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই কিতাব ছিল। অতএব চার বেদ আজও সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান রয়েছে। আর প্রত্যেক নবীই লোকদের মন্দ রীতি দূর করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন।" (মুকাবিসে মাজালিস, পৃষ্ঠা- ৩৮৮-৮৯, মুকাবিস নম্বর-৫২)

আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলাইমান নদভী লিখেন,

"আম্বিয়াদের সম্পর্কে এই হাকীকতটি সূরা মু'মিনেও পুণর্বার বয়ান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ 'এবং অবশ্যই আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কিছু সংখ্যকের কথা আমি আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কিছু সংখ্যকের কথা বিবৃত করিনি।' (সূরা মু'মিন: ৪)

তা'লীমে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিধান মেতাবেক এই বিশ্বাস করাও জরুরী যে, দুনিয়ার বড় বড় কওম এবং দেশ যেমন-চীন, ইরান, হিন্দুস্থানেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের আগমন ঘটেছিল। আর এজন্য এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা যে সকল বুযুর্গদের ইজ্জত ও সম্মান করে এবং নিজেদের দ্বীন ও মাজহাবকে যাদের দিকে সম্পৃক্ত করে, তাদের সততা, সত্যবাদিতার সার্বিক অস্বীকার কোন মুসলমানই করতে পারে না। এই নিরিখে কোন কোন বিদগ্ধজ্জন হিন্দুস্তানের কৃষ্ণ এবং রামকে এবং ইরানের জরথস্ত্রকে, এমনকি কেউ কেউ বুদ্ধকেও পয়গাম্বর বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। মোটকথা, তাদের কিংবা অন্য কারো নবী হওয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই তারা নবী ছিলেন কিনা, তা নিরূপণ করার মানদন্ড আল কুরআনেই সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে।" (সীরাতুন নবী, খণ্ড-৬,পৃষ্ঠা-১৬৯, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, প্রকাশ ১৯৯১ইং)

উল্লেখ্য,বিষয়টা হালকা করার কোন সুযোগ নেই। কুরআনে তো মানদন্ড দেয়াই আছে আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে নবী পাঠিয়েছেন। তাই কৃষ্ণ, রাম, জরথুস্ত ও গৌতম বুদ্ধকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে পিছুটান দেয়ার কোন অবকাশ নেই।

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী

"জ্বিনদেরই, হিন্দুদের কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনাঃ শিরোনামে বলেন, কালবী, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন। কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী (র.) তফসীর মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেনঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ.)-এর পূর্বে জ্বিনদের রসূল জিন্নদের মধ্য থেকেই আর্বিভূত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জ্বিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী সানাউল্লাহ (র.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেনঃ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদের সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে তারা এ জ্বিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জ্বিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জ্বিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।" (তাফসীরে মারেফুল কুরআন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ২৯-৩০, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)

আমরা জীনের বিতর্কে যাচ্ছি না। তবে হিন্দুদের অবতাররা জীন হোক অথবা মানুষ যাদেরই নবী হোক। ফলাফল এটাই দাড়াচ্ছে তাঁরাও আল্লাহ তা'লারই সত্য নবী ছিলেন। অর্থাৎ অবতার শ্রী কৃষ্ণ ও রামচন্দ্রও নবী ছিলেন।

মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান খান

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এই আয়াতের তফসীরে লিখেন" এই আয়াত থেকে সাব্যস্ত প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ তালার পয়গম্বর এসেছেন। আর অনেক পয়গম্বরের উল্লেখ আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে করেন নি। এজন্য মুসলমানদের কোন জাতির নবীকে

অস্বীকার করা উচিত নয়। আল্লাহ তালা খুব ভালোভাবেই জানেন, তারা নবী ছিলেন কিনা। (তফসীরে ওয়াহেদী, পৃ-৬৪৩)

শামস নবীদ উসমানী

"ভারতবর্ষের পবিত্রভূমিও পয়গম্বর শূন্য নয়। হযরত মুজাদ্দেদ আলফে সানী(র.)এর মত বুযুর্গরাও এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে রাখতেন, ভারতবর্ষে নবীরা আগমন করেছেন। আর তিনি এখানকার বিভিন্ন শহরে নবুওয়তের জ্যোতি প্রত্যক্ষ করেছেন।" (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৫৭)

তিনি আরও লিখছেন, "হযরত শাহ ওলী উল্লাহ(রহ.)-এর সমসাময়িক হযরত মির্যা মাযহার জানজানান (রহ.)-এর এক পত্র তিনি যা হযরত শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভীর নামে লিখেছেন। প্রফেসর খালিক নিযামী এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তিনি হিন্দুদেরকে শুধুমাত্র আরবের মুশরেকদের সাথে তুলনা করতে অস্বীকারই করেননি, বরং 'বেদ'-কে ইলহামী কিতাব মেনে নিয়ে হিন্দুদেরকে আহলে কিতাবের মর্যাদা দিতেন।" (আগার আব ভী নাহ্ জাগে তো, পৃষ্ঠা-৭১-৭২) (মকতুবাত, মির্যা মাযহার জানজানান শহীদ, অনুবাদ ও সংকলন-খালিক আনজুম, পৃষ্ঠা-৮৪)

মাওলানা মহিউদ্দিন খান, মাসিক মদিনা ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় বেদ, গীতা, পুরানকে আল্লাহর নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাব বলে উল্লেখ করেছেন। গীতা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরোপিত কিতাব। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দৃষ্টিতে কি ছিলেন? এবার বিষয়টা সম্মানিত পাঠকরাই একবার মিলিয়ে নিন।

* দারুল উলুম দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা, মাহনামাহ দারুল উলুম, সংখ্যা-২, খণ্ড-৯১, ফেব্রুয়ারী ২০০৭ -এ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষক মুহাম্মদ শামিম আখতার কাসেমীর ৫ পর্বের একটি প্রবন্ধ "সালাতীনে হিনদ কে এহদ ম্যাঁ গায়ের মুসলিমোঁ কী শারয়ী হায়সিয়্যত" এর "হিন্দুস্তান ম্যাঁ আম্বিয়া ও রসুল কে বা'সাত কা আমকান" শিরোনামের অধিনে লিখেন–

১) মুজাদ্দেদ আলফে সানী
২) মির্যা মাজহার জান জানা
৩) মুহাম্মদ কাশেম নানতুবী
৪) শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দেস দেহলভী
৫) মাওলানা মুনাযের আহসান গিলানী
৬) আব্দুর রহমান চিশতী
৭) আশরাফ আলী থানভী
৮) শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া
৯) আব্দুর রাজ্জাক হানসবী
১০) মাওলানা আব্দুল বারী ফারাঙ্গী মহল্লী
১১) আজমল খান
১২) সৈয়দ আখলাক দেহলভী
১৩) শামস নাবীদ উসমানী
১৪) কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী

–সবাই কৃষ্ণকে নবী বলে উল্লেখ করেছেন।

লেখক আরো বলছেন, আহলে কিতাবদের যে শরীয়তগত অধিকার দেয়া হয়, একই অধিকার মুহাম্মদ বিন কাশিমের যুগ থেকেই হিন্দুদের দিয়ে আসা হয়েছে।

এর কারণ কি? তাদেরকে (নিঃসন্দেহে) কোন নবীর উম্মত অথবা কোন ঐশী (আসমানী) কিতাবের অনুসারী বলেই মনে করা হতো। (মাহনামাহ দারুল উলুম, সংখ্যা-২, খণ্ড-৯১, ফেব্রুয়ারী ২০০৭)

তাই,উপরোক্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থেকে এটা সাব্যস্ত যে, শ্রী রামচন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণ আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী ছিলেন। বিষয়টা শুধু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ই উল্লেখ করেন নি।পবিত্র কুরআন ও হাদীস এর পাশাপাশি এ উম্মতের বুর্যুগান ও খ্যাতনামা আলেম উলামারাও বলে গেছেন। এটা তাঁর (আ.) পূর্ববর্তীরাও বলেছেন, পরবর্তীরাও বলেছেন। তবে আজকাল যেসব আলেম-উলামা শ্রী রামচন্দ্র ও শ্রী কৃষ্ণ নবী ছিলেন বিষয়টা শুনলে আঁতকে উঠেন, মানতে চান না, তওবা তওবা আওড়াতে থাকেন আর বলেন, এটা কিভাবে হতে পারে? তারা পড়াশোনা ও গবেষণা না করে অথবা জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতায় প্রবেশ না করেই এমনটা করেন।

তবে সাধারণ মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে খটকা ও অস্বস্তি থাকতে পারে। থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে আশা করি এ প্রবন্ধের পুরোটা বিশেষ করে নিম্নের শিরোনাম যুক্ত অংশটি পাঠ করলে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

সাধারণ মুসলমানরা শ্রীকৃষ্ণকে নবী মানতে নারাজ কেন?

সাধারণ মুসলমানরা শ্রীকৃষ্ণকে নবী হিসেবে মানেন না, মানতে চান না। শ্রীকৃষ্ণের নবী হওয়ার বিষয়টা তাদের কাছে একটা অসম্ভব বিষয়। এর কারণ হলো:

প্রথমত: বর্তমানে বিদ্যমান হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে সাধারণভাবে দৃষ্টি দিলে ও হিন্দুদের জীবনাচার প্রত্যক্ষ ক'রে তওহীদের শিক্ষা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত: খোদ হিন্দুরাও তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মানবীয় সৃষ্টিগত অবস্থানের উর্ধ্বে এক সত্তা মনে করে। অর্থাৎ নবী-রাসূলেরও উর্ধ্বে উপাসনাযোগ্য সত্তা বলে মান্য করে। আর বিষয়টা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাড়িয়েছে যে, এখন তাঁকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করাটা যে কারো পক্ষেই দূরুহ ব্যাপার।

তৃতীয়ত: তাঁদের নামে তাঁদের মান্যকারীরাই এতো সব জঘন্য ঘটনার অবতারণা করে রেখেছে, যে কারণে তাঁদেরকে নবী তো দূরের কথা সাধারণ সচ্চরিত্রবান মানুষও মনে হয় না।

তবে এ বিষয়গুলোর কোনটাই হযরত শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্র উভয়েই নবী হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় বা বাধা নয়। কেননা এরকম অপলাপপূর্ণ বিষয়াদি অনেক নবীর উপরই আরোপিত হয়েছে।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী (রহ.)এ বিষয়গুলো খণ্ডন করে তাঁদের নবুওয়তকে প্রতিষ্ঠাকল্পে এক চমৎকার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন- "বাকি রইল এই বিষয়, হিন্দুদের অবতার নবী ও আউলিয়া হলে খোদা হওয়ার দাবী করতেন না। এমনকি অশালীন ও অশোভনীয় কাজ যেমনঃ ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি কাজ তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হতো না। কেননা অবতারদের বিষয়ে অর্থাৎ হিন্দুরা এই দুইটি বিষয় তাদের অবতারদের বিষয়ে আরোপ ও বিশ্বাস করে থাকে। যা থেকে এটা সাব্যস্ত হয়, এই দুইটি কাজ অবশ্যই তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। অতএব এই আপত্তির উত্তর হলো, এটা হতে পারে যেভাবে ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে খৃষ্টানরা ঈশ্বরত্বের দাবী আরোপ করেছে অথচ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ তাদের বক্তব্যের বিরোধী। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারেও অনুরূপ দাবী আরোপিত হয়েছে। যেভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর কুরআন ও ইঞ্জিলের দলীল-প্রমাণ দ্বারা বান্দা হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত। আর এ বিষয়ে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাঁর নিজের বান্দাসুলভ কাজের সাক্ষ্যও রয়েছে। যা মোটেও খোদার কাজ নয়। অর্থাৎ নামায পড়া, রোযা রাখা, আর মৌখিকভাবেও নিজের মাঝে অনেক বিনয় প্রকাশ করা। যখনই কোন কথা বলতেন নিজেকে আদম-সন্তান এবং বান্দা হিসাবে আখ্যায়িত করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁরই উপর ঈশ্বরত্বের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তাই, এতে অবাক হওয়ার কি আছে! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম চন্দ্রের ব্যাপারেও ঈশ্বরত্বের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। যেভাবে হযরত লূত এবং দাউদ (আ.)এর ব্যাপারে নবওুয়তের বিশ্বাস সত্ত্বেও ইহুদী, খৃষ্টানরা মদ্যপান ও ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ করেছে। আর আমরা তাদেরকে এসব কাজ থেকে পবিত্র মনে করি। একইভাবে অবাক হওয়ার কিছু নেই, শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী রামচন্দ্রের ব্যাপারেও উপরোক্ত অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।" (মুবাহাসা শাজাহানপুর, ৩১ পৃষ্ঠা)

তবে যেকোন ধর্মের নবীর বিষয়টি জানার জন্য এর যে মূল শিক্ষা রয়েছে এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এ দৃষ্টিকোন থেকে আমরা যখন শ্রী কৃষ্ণের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেই তখন সেখানে তওহিদের শিক্ষাই দেখতে পাই। গীতার ১৮:৬১/৬২; ৯:১৮; ১০:২ শ্লোকের উক্তিগুলো পাঠক দেখে নিতে পারেন।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট, আজ থেকে একশত বছরের অধিককাল পূর্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের অমোঘ ঘোষণা- 'প্রত্যেক জাতির মাঝে নবী-রসুল এসেছেন' অনুযায়ী ভারতবর্ষেও নবীরা এসেছেন। শ্রী কৃষ্ণ, শ্রী রামচন্দ্র ও বুদ্ধ প্রমুখগণও নবী ছিলেন মর্মে তিনি বলে গেছেন। এই বিষয়টা মুফাসসেরিন, বুযুর্গান, মুসলিম মনিষী ও বিদগ্ধ আলেম-উলামারাও বলে গেছেন। তারাও হযরত শ্রীরাম চন্দ্র ও হযরত শ্রী কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের চেয়ে আধ্যাত্মিক দিক থেকে উপরের স্তরে অবতার তথা নবী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ কারণে, আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা সবাই গোড়াতে সত্য ছিলেন। তাঁরা একত্ববাদের শিক্ষাই জগতে প্রচার করে গেছেন। তাঁদের নামে পরবর্তীতে বিভিন্ন বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, অপবাদ রটানো হয়েছে। আমরা সেগুলো স্বীকার করি না, বিশ্বাসও করি না। তাই বিষয়টি নিয়ে মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে ভাবা দরকার। এতে করে একদিকে যেমন সত্য উন্মোচিত হবে তেমনি অপরদিকে এটি অশান্ত বিশ্বে আজ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সেতুবন্ধন হিসেবেও কাজ করবে। পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগান্তকারী উদ্ধৃতি দিয়ে আমার প্রবন্ধের ইতি টানছি। প্রকৃত সত্য সবার কাছে উদ্ভাসিত হোক–

" আমরা কখনও অন্য জাতির নবীগণের অবজ্ঞা করি না। বরং এটাই আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিতে যত নবী এসেছেন এবং কোটি কোটি লোক তাঁদেরকে মেনে নিয়েছে আর পৃথিবীর কোন অংশে তাঁদের ভালোবাসা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সুদীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এ একটি প্রমাণই তাঁদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কেননা যদি তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে না হতেন তবে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো না। খোদা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের সম্মান কখনো অন্যকে দেন না। যদি কোন মিথ্যাবাদী তাঁদের আসনে বসতে চায়, তাহলে শীঘ্রই তাকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়।" (পয়াগামে সুলেহ, পৃষ্ঠা-১৫)

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র কুরআন ২. মিশকাতে মাসাবী ৩. তফসীর ইবনে কাসির ৪. তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াই ৫.তারীখে হামযান ৬.আল মুজেমুল আওসাত ৭. তাফসীরে নাসাফী ৮. তাফসীর রুহুল বায়ান ৯. তাফসীরুল কাশাফ১০. চশমায়ে মারেফাত ১১. তালীমুল ইসলাম ১২. দাসতুরুল উলামা জামেউল উলুম ফি ইসতেলাহাতিল ফুনুন১৩. মকতুবাত, মির্যা মাযহার জানজানান শহীদ ১৪.ফতোয়ায়ে আজিজী ১৫. মুকাবিসে মাজালিস ১৬.সীরাতুন নবী ১৭. তাফসীরে মারেফুল কুরআন ১৮.তফসীরে ওয়াহেদী ১৯.আগার আব ভী নাহ্ জাগে ২০.মাসিক মদিনা ২১.দারুল উলুম দেওবন্দের মাসিক পত্রিকা, মাহনামাহ দারুল উলুম, সংখ্যা-২, খণ্ড-৯১, ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ২২.মালফুযাত ২৩. পয়াগামে সুলেহ ২৪. কল্কী জগৎপতি ২৫. কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ২৬. মুসলিমের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ।

সংবাদ

যুক্তরাজ্যস্থ বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৬ই আগস্ট, ২০১৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যস্থ বাংলা বিভাগ এক সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার আয়োজন করে ও যুক্তরাজ্যর ইস্ট লন্ডনস্থ বায়তুল আহাদ মসজিদে অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যস্থ বাংলা বিভাগ-এর ইনচার্জ ডাক্তার আবদুল্লাহ জাকারিয়া ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর আলহাজ মোহতরম মোবাশশের উর রহমান ও সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার এ সভায় পবিত্র কুরআন মজিদ হতে তেলাওয়াত করেন জনাব ফুয়াদ আলম ও তেলাওয়াতকৃত আয়াতসমূহের বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদ করেন যথাক্রমে জনাব মুবারেজ আহমদ সানি ও জনাব আফরাজ জাকারিয়া ও হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রসংশায় রচিত এ অনুষ্ঠানে একটি উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব তাইদ আলম এবং এর ইংরেজী অনুবাদ করেন জনাব মাশহুদ আহমদ ফাইয়াজ ও সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা ২০১৭-এর কনভেনর হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী ও তিনি তাঁর বক্তব্যে সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্বারোপ করেন ও তিনি বলেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন ও তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)- এর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরেন এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.)- এর ভবিষদ্বাণী ও মহান আদর্শ অনুসারে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর গঠনমূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ উল্লেখ করেন। অতঃপর মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম "শান্তির দূত-মহানবী (সা.)" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজকের অশান্ত বিশ্বে মহানবী (সা.)- এর মহান আদর্শের অনুসরণ ও অনুশীলনের বড়ই প্রয়োজন ও মহানবী (সা.)- এর অতুলনীয় চারিত্রিক গুণাবলীর উল্লেখ করে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব বলেন, আন্তর্জাতিক, সামাজিক , অর্থনৈতিক , রাজনৈতিকসহ সকল স্তরেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজেদের জীবনে তাঁর (সা.) মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে অন্যথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়, অসম্ভব এবং অবাস্তব।

আলহাজ মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.)- এর উপর দরূদ পাঠের গুরুত্বারোপ করেন ও তিনি বলেন, দরূদ পাঠ হচ্ছে এমন একটি শক্তিশালী আশীর্বাদ যা পৃথিবীর সকল সাফল্য ও অর্জন নিশ্চিত করে। বাংলাবিভাগ-এর ইনচার্জ ডাক্তার আবদুল্লাহ জাকারিয়া তাঁর সমাপ্তি ভাষণে পাশ্চাত্যের পন্ডিত ও গবেষকদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা তুলে ধরেন ও ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আজকের বিশ্বে জিহাদের নামে তথাকথিত ইসলামপন্থীরা যে তান্ডব মাতিয়ে রেখেছে তা কোনোক্রমেই ইসলামের সঠিক শিক্ষা নয় ও সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাবিভাগ-এর সেক্রেটারী জনাব মনসুর আহমদ।

আলোচনা শেষে এক প্রশ্নোত্তর সভায় উত্তর প্রদান করেন মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। পরিশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মনসুর আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

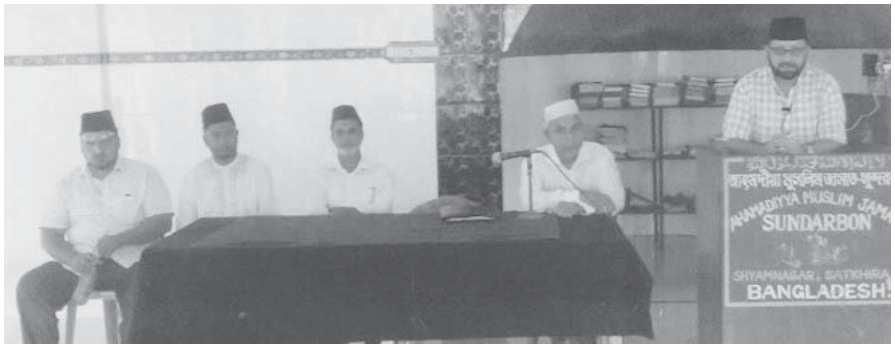

মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে গত ২০৩/০৭/২০১৭ তারিখ রোজ রবিবার বাদ যোহর মোহতরম সদর সাহেবের উপস্থিতিতে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর সাহেব উপস্থিত ছিলেন নায়েব সদর হালিম আহমদ হাজারী রিজিয়নাল নাযেম আলা, জনাব আব্দুর রাজ্জাক জেলা-নাযেম আলা, এস.এম.রবিউল ইসলাম ও সুন্দরবনের আমীর এস.এম.রজব আলী। সদর সাহেব উপস্থিত সকল আনসার ভাইদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন।

সভায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশসহ মোট ৬৫ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। সদর সাহেবের দোয়া ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে সাধারণ সভার সমাপ্তি হয়।

গাজী মিজানুর রহমান, উমুমী

৩ দিন ব্যাপী ইউ.কে. সালানা জলসা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনে ৩ দিন ব্যাপী ইউ.কে. সালানা জলসা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল প্রত্যহ বেলা ৩টা হতে রাত্র ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলছিল। প্রতিদিন বিকাল ও সন্ধ্যায় নাস্তা ও রাতের খাবার ব্যবস্থা ছিল।

৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ১৮ জন জেরে তবলীগ সহ সর্বমোট ২৬০ সদস্য উপস্থিত ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. রেজাউল করিম এর তত্ত্বাবধানে এম.টি.এ-এর দ্বারা প্রজেক্টরের মাধ্যমে বড় পর্দায় দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

গাজী মিজানুর রহমান, উমুমী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রঘুনাথপুর বাগ-এর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০৮/২০১৭ তারিখ বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রঘুনাথপুরবাগ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট, আয়েশা আতিয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন রিপা মাহমুদ, নযম পাঠ করেন সুরাইয়া ইসলাম নদী, হাদীস পাঠ করেন নাজমা ইসলাম এবং দোয়া পরিচালনা করেন ফাতেমা আহমদ মোফাত্তিস, খুলনা অঞ্চল। পর্দার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন রাশিদা ওয়াদুদ। তরবিয়তী আলোচনা করেন ফাতেমা আহমদ মোফাত্তিস, খুলনা অঞ্চল। লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ মোট ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নাজমা ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১২/০৮/২০১৭ তারিখ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্, উথলীর উদ্যোগে স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন হয়েছে, আলাহামদুলিল্লাহ্। খাকসার মোছাঃ সেলিনা আকতার প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত উথলী এই মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত, নযম, আহাদনামা পাঠ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, কুরআন তিলাওয়াত, কাসিদা, নযম, বক্তৃতা, খেলাধূলা ও পয়গামে রেসানী। উপস্থিত সংখ্যা মোট ২০ জন। ১ম অধিবেশন শেষ হয় দুপুর ১২টায় তারপর জুমুআর নামায আদায় করা হয়। সমাপনী অধিবেশনে কুরআন তিলাওয়াত করেন মোছাঃ সালমা জুয়েল এবং নযম পাঠ করেন মোছাঃ তাজবীহা রহমান রিয়া। সবশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মোছাঃ সেলিনা আকতার, প্রেসিডেন্ট

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নাসিরপুর সফর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব গত ২৪শে আগস্ট ২০১৭ বৃহস্পতিবার ঘাটুরা জামাতের অর্ন্তগত নাসিরপুর হালকা পরিদর্শন করেন। ঐ দিন ভোরে তিনি নাসিরপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা হতে রওনা করেন। আমীর সাহেবের সফর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত, নও-মোবাইন আবু জাকির আহমদ ও মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নুরুল আমীন সাহেব। ঘাটুরা জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুছা মিয়া সহ ঘাটুরা ও সরাইল জামাতের কিছু সংখ্যক সদস্য নাসিরপুরে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় হালকা প্রেসিডেন্ট ঈসা মিয়া সাহেব ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও সফর সঙ্গীদের স্বাগত জানান । নাসিরপুরে সম্প্রতি একটি নামায ঘর পুনঃনির্মিত হয়েছে। এতে প্রায় ৬০ জন পুরুষ ও ৪০ জন মহিলা নামায আদায় করতে পারেন। উল্লেখ্য, নাসিরপুর ঘাটুরা জামাত হতে ২২-২৫ কি: মি: দূরে অবস্থিত নাসিরনগর উপজেলার অর্ন্তগত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। নাসিরপুর গ্রাম পূর্ব বাংলার প্রথম আমীর মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্মস্থান। তিনি স্থানীয় "বড় পীর" হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার বসতভিটা সাহেব বাড়ী হিসাবে পরিচিত। তার অনেক ভক্ত ও মুরিদ ছিল। আহমদীয়াত গ্রহনের পর তিনি পীর প্রথা পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় হিজরত করেন। তার বংশধরেরা এখনো পীর প্রথা বজায় রেখেছেন।

সম্প্রতি নাসিরপুর গ্রাম ও আশে পাশের এলাকায় প্রায় শতাধিক নারী ও পুরুষ বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হয়েছেন। বয়আত গ্রহনকারীগণ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। জোনাল তবলীগ ইনচার্য মাওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম সাহেব উপস্থিত সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমীর সাহেব দীর্ঘ সময় নিয়ে বয়আত গ্রহনকারীদের (নও-মোবাইন) নসিহত করেন এবং আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার ফজিলত তুলে ধরেন। সে সময় ৪০ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা নও-মোবাইন এবং ২০জন মেহমান (জেরে তবলীগ) উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে শিশু ও পুরানো আহমদী সদস্য সহ মোট ১২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলে বা-জামাত যোহর ও আসর এর নামায আদায় করেন। উপস্থিত সকলের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। ন্যাশনাল আমীর সাহেব স্থানীয় এলাকাটি ঘুরে দেখেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেন।

-আবু জাকির আহমদ

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট আদেশও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।"

–হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)

* শুভ বিবাহ *

গত ০৩/১০/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ দিতি আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ হামিদুল ইসলাম, গ্রাম: শালশিড়ী, থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আহমেদ, পিতা- মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ, দেয়ান টুলি, রংপুর-এর বিবাহ ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১১/১৭

গত ০৩/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ নাসারিন আক্তার, মোহাম্মদ মতিউর রহমান, গ্রাম: টেক্সদিঘীর পাড়, পো:+ জেলা: রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ তৌফিকুল হক, পিতা: মোহাম্মদ জহিরুল হক, সবুজ পাড়া নীলফামারি-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১২/১৭

গত ১৩/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ উম্মে হাবিবা তামান্না, মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, বাড়ী নং-৬৯ রোড ৯/এ ধানমন্ডি ডাক জিগাতলা ১২০৯ ঢাকা-এর সাথে এস, এম তাদাব্বুর ইসলাম, পিতা- এস এম আব্দুল মাজেদ, গ্রাম: কুমারী, স্কুলপাড়া কুমারড়ী-এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৩/১৭

গত ২৪/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ রোসানা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম ভুইয়া, গ্রাম: বাসুদেব, পো: বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ চৌধুরী আমানত উল্লাহ্, পিতা- চৌধুরী মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, গ্রাম: দেবগ্রাম, আখাউড়া-এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৪/১৭

গত ০৭/০৪/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ফারজানা আক্তার শারমিন, পিতা- মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, গ্রাম:লক্ষীপুর জামালগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ, পিতামৃত- মোহাম্মদ আনিস আলী, বীর দক্ষিণ, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ) হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৫/১৭

গত ১০/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ জিনাত জাহান (মুনমুন), পিতা-মীর মোহাম্মদ বশির উদ্দিন মাহমুদ, গ্রাম: নয়াপাড়া, পো:+থানা: জামালপুর, জেলা: জামলপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, পিতা- মোহাম্মদ বদিউজ্জামান, কালীনগর, বালুচর, শেরপুর-এর বিবাহ ৩,৩৬,০০০/- (তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানা সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৬/১৭

গত ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ আছিফা খাতুন (দিনা), পিতা মোহাম্মদ আফতাব হোসেন, গ্রাম: কাফুরয়া জেলার পাড়া, পো: দোস্তানাবাদ, জেলা: নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মোহাম্মদ দাউদ আরী গাজী, গ্রাম: মীরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৭/১৭

গত ২৯/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, পিতা-মোহাম্মদ শাহাজান আলম, দক্ষিণ কাচারী পাড়া, জামালপুর-এর সাথে মোহাম্মদ রাসেল মিয়া, পিতা- মোহাম্মদ মুজিবর রহমান, গ্রাম: রাংটিয়া পো: রাংটিয়া, থানা; ঝিনাইগাতী, জেলা: শেরপুর-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৮/১৭

গত ১৫/০৫/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎসুরাইয়া পারভীন, পিতা- মোহাম্মদ ফরিদউদ্দিন গাজী, গ্রাম: ভেটখালী, পো: ভেটখালী, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ রমজানুল মোবারক, পিতা- মোহাম্মদ মাগফুর রহমান, মোড়ল, গ্রাম: যতীন্দ্রনগর, পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৭০,০০১/- (সত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪১৯/১৭

গত ২৬/০৫/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মাজেদা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সরকার, গ্রাম: দেওয়ান পাড়া, কবিরপুর, থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ সুজন হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, গ্রাশ: শালশিড়ি, থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২০/১৭

গত ২৩/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ তামান্না পারভীন বৈশাখী, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, গ্রাম: বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পিতা- মোহাম্মদ ইয়াদ আলী, গ্রাম+পোঃ জোড়শিং, থানা: কয়রা, জেলা: খুলনা-এর বিবাহ ৮০,০০১/- (আশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২১/১৭

গত ১৭/০৩/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সারিয়া খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ আনারুল ইসলাম, গ্রাম: চৌবাড়ীয়া, পোঃ ভোমরা, থানা-জেলাঃ সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (অনিক), পিতা- শেখ মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ গ্রাম+ পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫৬,০০১/- (ছাপ্পান্ন হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২২/১৭

গত ২৩/০১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ মোহছেনা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেন, গ্রাম: বড়ভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ গোলজার তাহের (রিপন), পিতা- মোহাম্মদ নজির হোসেন, গ্রামঃ আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, থানা: বোদা, জেলা: পঞ্চগড়-এর বিবাহ (পয়ষট্টি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৩/১৭

গত ২৮/০৬/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ ফাতেমা নূর, পিতা- মোহাম্মদ মিজানুর রহমান গাজী, গ্রাম–পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ ইয়াছিন মোল্লা, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ মোল্লা, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৪/১৭

গত ০৩/০৭/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ সোনিয়া খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল আলীম ঢালী, গ্রাম: ছোটভেটখালী, পোঃ যতীন্দ্রনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন বুলু, পিতামৃত- আব্দুল খালেক তরফদার, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৮০,০০১/- (আশি হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪২৫/১৭

আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ করুন

হুযূর(আই.)-এর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের খুতবার আলোকে প্রস্তুতকৃত

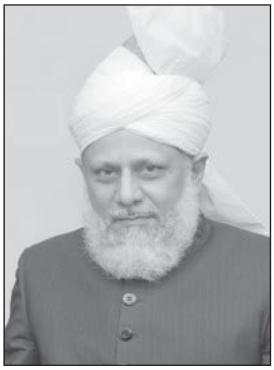

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই.)

১। আমরা কি বয়াতের ১০টি শর্ত গত বছর যথাযথভাবে পালন করেছি?

২। আমরা কি শির্‌ক থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পেরেছি?

৩। আমরা কি লৌকিকতামুক্ত আমল করতে পেরেছি? অর্থাৎ মানুষকে খুশি করার জন্য নয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য কাজ করতে পেরেছি?

৪। আমরা কি প্রবৃত্তির সুপ্ত লালসা ও বাসনামুক্ত আমল করতে পেরেছি?

৫। আমাদের নামায, রোযা ও সদকা-খয়রাত ও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার, মানবসেবার যাবতীয় কাজ বা ঐশী জামাতের কাজে প্রদত্ত সময় কি কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছিল? নাকি এসব নিছক লৌকিকতা এবং মানুষকে খুশি করার জন্য আমরা করেছি?

৬। আমাদের মনের সব সুপ্ত-বাসনা খোদাপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি তো?

৭। গত বছরটি আমরা কি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা পরিহার করে এবং সত্যে অবিচল থেকে অতিক্রান্ত করেছি?

৮। আমরা কি নিজের ক্ষতিসাধন করে হলেও সর্বাবস্থায় সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করতে পেরেছি?

৯। মনের মাঝে নোংরা ও অশ্লিল চিন্তাধারার উদ্রেক করে– আমরা কি নিজেদেরকে এমন সব আয়োজন ও অনুষ্ঠান থেকে বিরত রেখেছি?

১০। টিভি, ইন্টারনেটে পরিবেশিত অথবা এমনসব অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো দেখলে অন্তরে নোংরা চিন্তাধারা জন্ম নেয় আমরা কি এসব পরিহার করতে পেরেছি? (যদি এর উত্তর 'না' হলে আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ)

১১। আমরা কি কুদৃষ্টি নিক্ষেপের বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বা করে চলেছি?

১২। আমরা কি বিগত বছরে দুষ্কর্ম ও পাপাচারের যাবতীয় উপলক্ষ্য থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি? [উল্লেখ্য, মহানবী(সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেয়াও দুষ্কর্ম ও অবাধ্যতা বলে গণ্য।]

১৩। আমরা কি নিজ নিজ গণ্ডিতে সব ধরনের অত্যাচার-অনাচারের পথ পরিহার করতে পেরেছি?

১৪। আমরা কি সব ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছি?

১৫। আমরা কি সব ধরনের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি? [চরম দুরাচারী এবং পর-নিন্দুক ও পরচর্চাকারীকেও মহানবী(সা.) নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়েছেন।]

১৬। আমরা কি সব ধরনের বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছি?

১৭। আমরা কি গত বছর নিজেদেরকে রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছি? (সর্বস্তরে অশ্লীলতা ও সর্বগ্রাসী নগ্নতার এ যুগে রিপুর তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করাও একটি জিহাদ।)

১৮। আমরা কি গত বছর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায বিনা ব্যতিক্রমে নিয়মিতভাবে আদায় করতে পেরেছি? (কেননা নামায পরিত্যাগ করা মানুষকে শিরক ও কুফরির নিকটবর্তী করে দেয়।)

১৯। আমরা কি বিগত বছরে যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট ছিলাম? [মহানবী(সা.) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তে সচেষ্ট থেকো, কেননা এটি খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাদের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নৈকট্যলাভের উত্তম পন্থা এবং এর অভ্যাস মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে ও পাপমোচন করে। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকেও মানুষকে এটি রক্ষা করে।]

২০। আমরা কি হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্য নিয়মিত বিনা ব্যতিক্রমে দরুদ পাঠ করেছি ও এখনও করে যাচ্ছি? (বিশ্বাসী মুমিনদের জন্য এটি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ আদেশ আর দোয়া গৃহীত হবার একটি কার্যকর মাধ্যম।)

২১। আমরা কি নিয়মিত ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২২। আমরা কি নিয়মিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি?

২৩। আপন-পর নির্বিশেষে যে কাজ কাউকে সামান্যতম কষ্ট দেয়– আমরা কি এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি?

২৪। আমাদের কথায় বা কাজে কেউ যেন আঘাত না পায়– আমরা কি এমনভাবে বছরটি কাটিয়েছি?

২৫। আমরা কি মানুষের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনাসূলভ আচরণ করতে পেরেছি?

২৬। বিগত বছরে বিনয় ও নম্রতা কি আমাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল?

২৭। সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে বা বিপদে– সর্বাবস্থায় আমরা কি আল্লাহ্‌র সাথে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছি?

২৮। বিপদাপদের সময় আমরা আল্লাহকে অভিযুক্ত করে ফেলি নি তো?

২৯। সামাজিক কদাচার ও প্রবৃত্তির মোহ থেকে আমরা কি নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি?

৩০। আমরা কি কুরআন শরীফ ও মুহাম্মদ(সা.)-এর নির্দেশাবলী ষোল আনা পালনে সচেষ্ট ছিলাম?

৩১। আমরা কি অহংকার ও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পেরেছি?

৩২। আমরা অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি? (কেননা শিরকের পর অহংকার ও আত্মম্ভরিতা হল সবচেয়ে বড় আত্মিক পাপ।)

৩৩। গত বছরটিতে আমরা কি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী রপ্ত করার চেষ্টা করেছি?

৩৪। আমরা কি সহিষ্ণুতা ও বিনম্রতার বৈশিষ্ট অবলম্বন করতে সচেষ্ট থেকেছি?

৩৫। গত বছরের প্রতিটি দিন কি আমরা ধর্মসেবায় এবং এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছি?

৩৬। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার আমরা করে থাকি তা সারশূন্য বা বুলি সর্বস্ব নয় তো?

৩৭। আমরা কি ধর্ম সেবাকে নিজেদের ধন-সম্পদের ওপর স্থান দিতে পেরেছি?

৩৮। আমরা কি ধর্মকে নিজ মান-সম্ভ্রমের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে পেরেছি?

৩৯। আমরা কি ধর্মকে নিজ সন্তানদের চেয়েও প্রিয়তর জ্ঞান করতে পেরেছি?

৪০। আমরা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট ছিলাম?

৪১। আমরা কি আমাদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করতে সচেষ্ট ছিলাম?

৪২। আমরা কি নিজেদের মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৩। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততির মাঝে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করার চেতনা চিরজাগরুক থাকার এবং এ চেতনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার জন্য দোয়া করেছি?

৪৪। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সাথে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্বের ও আনুগত্যের সম্পর্ককে আমরা কি ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছি যার তুলনায় জগতের সকল সম্পর্ক তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়?

৪৫। আমরা কি গত বছর আহমদীয়া খেলাফতের সাথে নিবিড় ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি?

৪৬। আমরা কি নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে আহমদীয়া খেলাফতের সাথে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক গড়ার বিষয়ে বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেছি? আর এদিকে তাদের মন আকৃষ্ট হবার জন্য কি দোয়া করেছি?

৪৭। আমরা কি যুগ-খলীফা ও এ জামা'তের জন্য নিয়মিত দোয়া করেছি?

প্রকাশনায়: আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

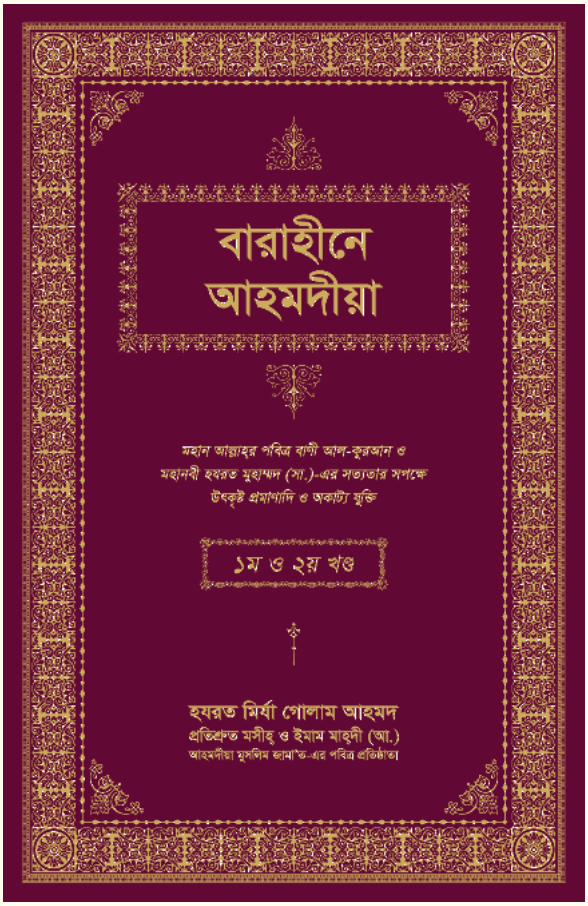

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

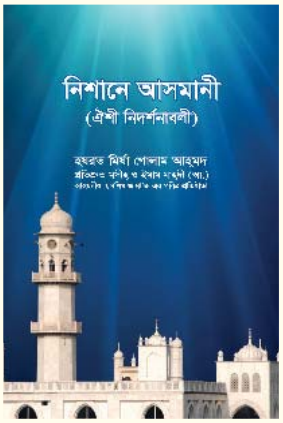

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্‌দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

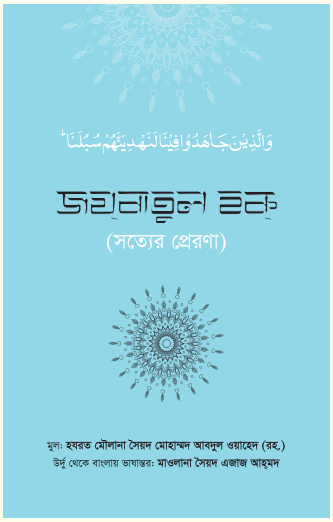

জয্‌বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

New Vol. No. 80 | 5th Issue

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

15th September, 2017 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

একটু পড়েই দেখি-

"যারা খাবারের বিলটা সবসময়ই নিজে দিতে চায়, তার মানে এই নয় যে, তার টাকা উপচে পড়ছে। এর কারণ সে টাকার চেয়ে বন্ধুত্বকে বড় করে দেখে।"

"যারা আগে ভাগেই কাজ করে ফেলে, এর মানে সে বোকা নয়, আসলে তার দায়িত্বজ্ঞান রয়েছে।"

"যারা ঝগড়া বা বাক-বিতন্ডার পরে আগে মাফ চেয়ে নেয়, সে-ই ভুল ছিল এমনটি নয় বরঞ্চ সে চারপাশের মানুষকে মূল্যায়ন করে।"

"তোমাকে যে সাহায্য করতে চায় সে তোমার কাছে কিছু আশা করে না বরং একজন প্রকৃত বন্ধু মনে করে।"

"কেউ আপনাকে প্রায়ই টেক্সট করে তার মানে এটা নয় যে, তার কোন কাজ নেই, আসলে সে আপনাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে।"

"একদিন আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো, কিন্তু আমাদের আচরণ ও ভালোবাসাগুলো মানুষের হৃদয়ে থেকে যাবে। কেউ না কেউ স্মরণ করবে, এ হচ্ছে সেই মানুষ যার সাথে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কিছু সময় কাটিয়েছি।"

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

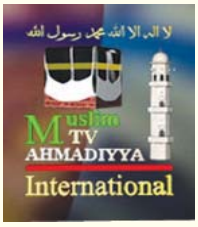

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com